বলাকা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ

১৯১৬

মূল্য এক টাকা মাত্র

বাতায়ন

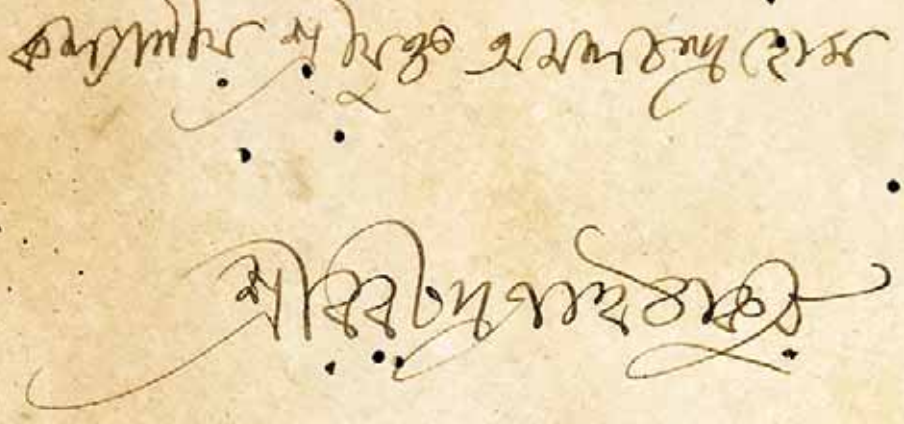

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্‌ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই মে ১৯১৬
তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর

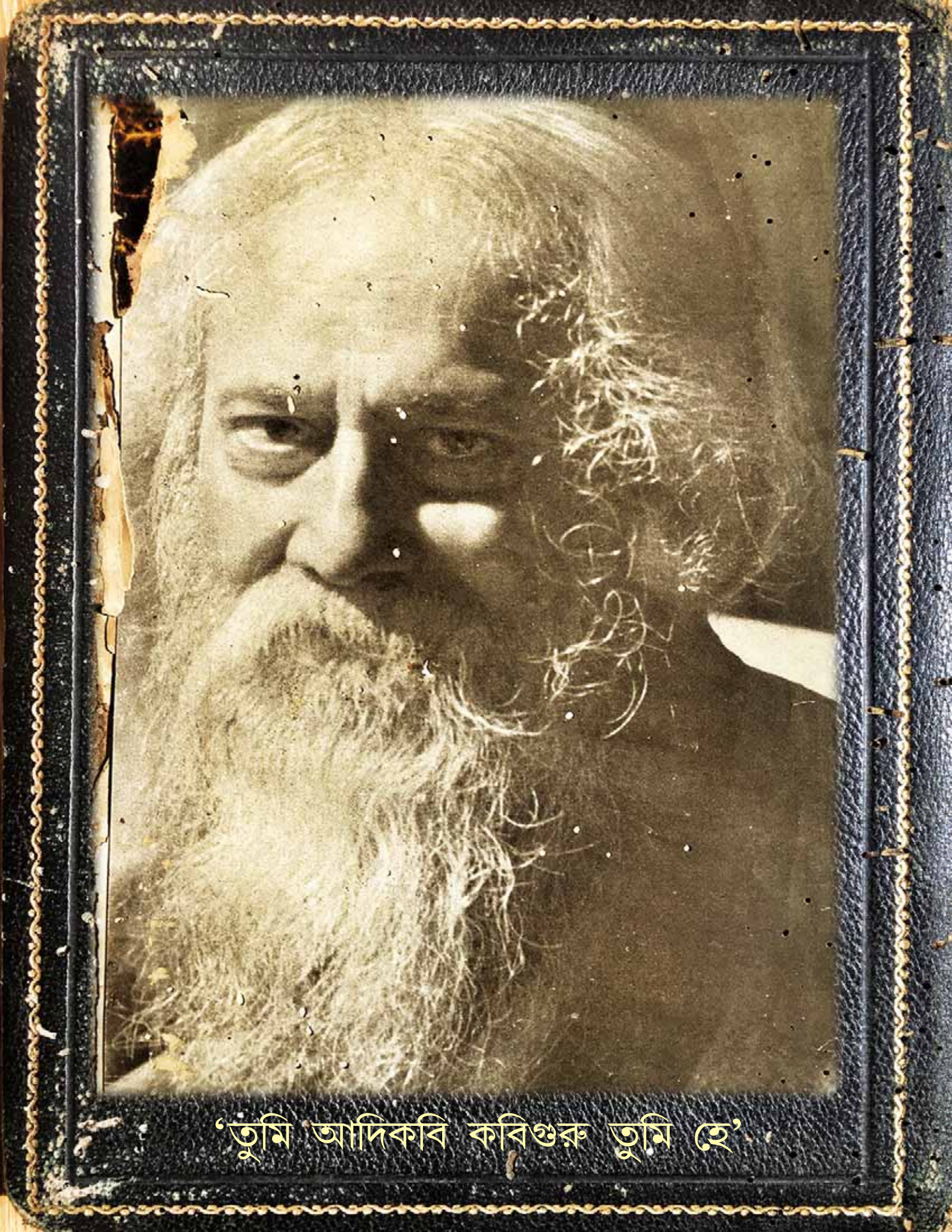

‘তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে’

The Cover Story

Samrat Ghosh, UK

The story of this book is interesting. My father, Shanker Kumar Bose, was gifted this by an acquaintance. He knew my father collected old curios. This gentleman purchased it from a bookstall on the footpath for Rs 5 only.

Interestingly, you will note that this book was printed in Allahabad, even though there were printing presses in Calcutta at the time. The reason for this is not clear. But this does prove that at least one Allahabad press had facilities to print in Bengali at the time.

This first edition of the book was personally gifted to Mr Amol Holme, who was Secretary to Tagore and later on worked for Calcutta Corporation.

প্রচ্ছদের গল্প

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

'বলাকা', শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক: ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। মূল্য: এক টাকা মাত্র।

বইটি হাতে এল কি করে ? সে এক মজার গল্প। শ্রী শঙ্কর কুমার বোস পুরনো কয়েনের সংগ্রাহক। এক বন্ধু তাঁকে এই বইটি উপহার দেন। শঙ্করবাবুর বন্ধু কলকাতার এক ফুটপাতের স্টল থেকে এই বইটি কেনেন মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে। বইটির প্রকাশ সাল ১৯১৬। কলকাতায় তখন ছাপাখানা ছিল। তা সত্ত্বেও কেন এলাহাবাদ থেকে বইটি ছাপা হল তার সঠিক কারণ জানা যায় না। 'বলাকা'র এই সংস্করণটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেক্রেটারি শ্রী অমল হোমকে নিজের হাতে সই করে দিয়েছিলেন।

এখন এই বইটি শঙ্করবাবুর পুত্র ইংলন্ড নিবাসী সম্রাট বোসের কাছে আছে। বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই এই অমূল্য সংগ্রহ আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য।

বলাকা ১

'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা ।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা ।'

বাতায়ন

‘শুভেচ্ছা, অপরাজিত আলো
ভোর এসে জানলায় দাঁড়ালো
... .
শরীর আনন্দে পুড়ে খাক
কাল ভোরে পঁচিশে বৈশাখ ।’

আলো / এগারো
জয় গোস্বামী

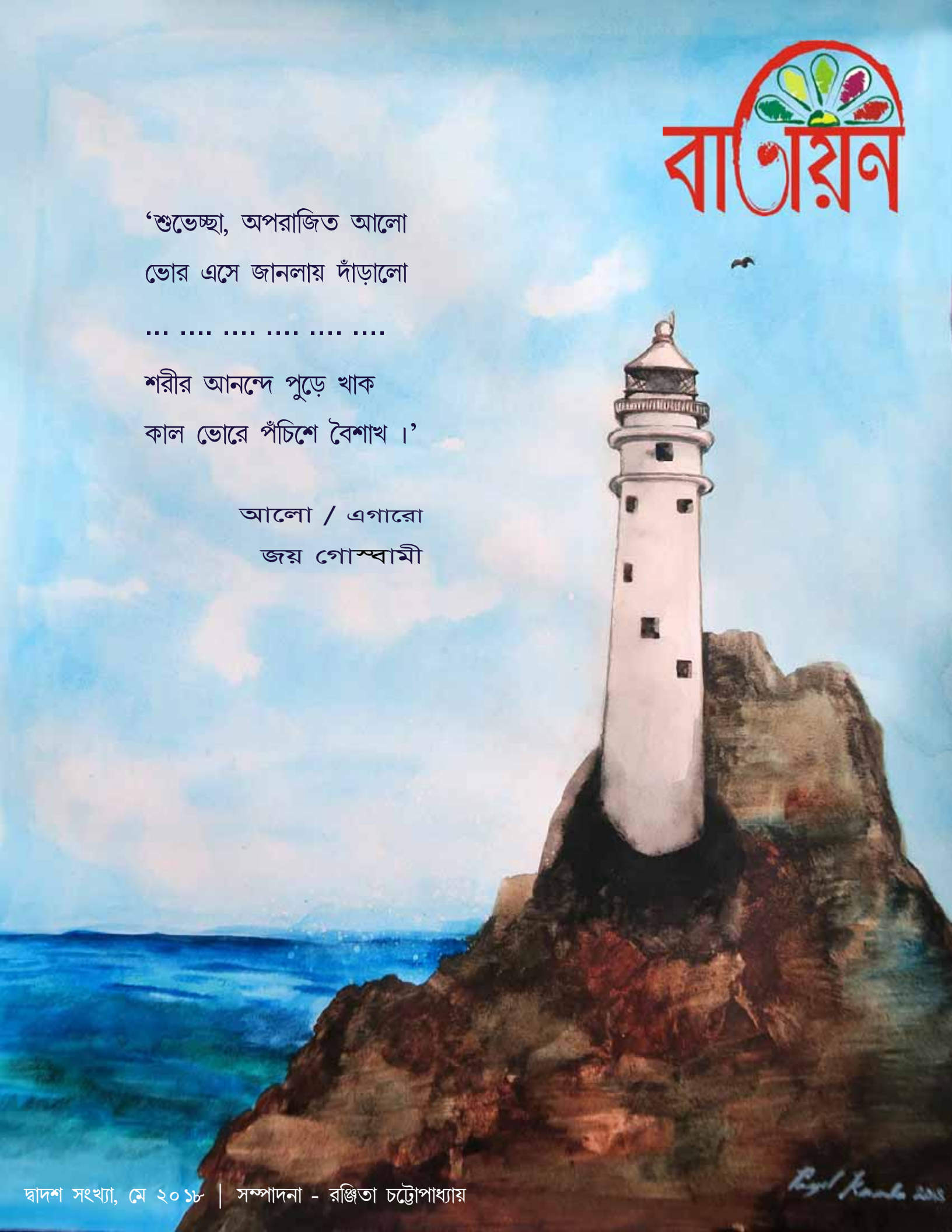

দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০১৮ | সম্পাদনা - রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Issue Number 12 : May, 2018

Editor
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Payel Kundu **Title page – Lighthouse**

I have always had a deep interest in the minds of others, and how they experience the world. I pursue this interest partially as a neuroscientist, and partially through my art. It is impossible to truly experience something through the eyes of someone else, but my work tries to capture the experiences of those around me, and inevitably, how I experience them as well through the lens of my depiction. I love sharing my thoughts with others in this visual way, and I love seeing the contents of other people's brains in the form of their art as well.

Durba Bandyopadhyay **Inside Back – Darjeeling Rhododendron, Pg 37**

Durba is a doctorate in Microbiology, currently a consultant with IMRB — Kantar for an UNICEF governed project on Health & Nutrition. Photos taken in Darjeeling during her recent visit. Durba loves art, poetry and music.

Saumen Chattopadhyay **Pancharaser Dhara, Pg 48**

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

এ আলো আবহমান

‘তোমার নামে অশ্রু ঘামে রক্তে থামে যজ্ঞ ঘোড়া
তোমার নামে শহর গ্রামে ডাইনে বামে ফুলের তোড়া।
তোমার নামে হৃদয় ধামে বৃষ্টি নামে তাকুড়-নাকুড়
তোমার নামে দুঃখের দামে সুখের খামে লিখছি ঠাকুর।।’

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি/ভবানীপ্রসাদ মজুমদার)

বাতায়নের মে সংখ্যার পরিকল্পনাটি হঠাৎ করে মাথায় এল। বাঙালীর কাছে মে মাস বিশেষ তাৎপর্যবাহী। মে মাস কবিগুরুর জন্মমাস। আজ থেকে ১৫৭ বছর আগে ইংরাজী ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম হয়। জন্মের পর দেড়শ বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গেছে। আজও তিনি আমাদের চিন্তায়, ভাবনায়, আশায়, স্বপ্নে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই জড়িয়ে আছেন। এ কিছু নতুন কথা নয়। এ কথা বিগত শতাব্দীতে নানাজন নানাভাবে বলেছেন। কিন্তু বারবার বলেও এই সহজ কথাটির গুরুত্ব কমে না কোনভাবে। বরং আজও তা আর একবার বৃষ্টি নামায় বাঙালীর হৃদয়ে, ভাবায় রবীন্দ্রনাথ নামের এই বিশাল ব্যক্তিত্বটির সম্বন্ধে।

তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই বাতায়নের মে সংখ্যার বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ। বংলায় রবীন্দ্রচর্চা প্রসঙ্গে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁকে নিয়ে আলোচনার মূল ধারা দুটি। একটি ধারায় তাঁর কাজ – তাঁর লেখা, তাঁর গান, তাঁর ছবি – অন্য ধারায় তাঁর জীবন। এই দুই ধারাই দেশী বিদেশী, খ্যাত অখ্যাত বহু মানুষের মননের আলোয় বিশ্লেষিত হয়েছে বারেবারে। তাই এখনও কেন কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ – এ প্রশ্ন মনে জাগা আশ্চর্যের নয়। তাঁকে ঘিরে সব কথাই কি বলা হয়ে যায় নি এতদিনে ? এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করতে গিয়ে একটি বহু ব্যবহৃত উপমারই সাহায্য নিলাম। সাগর থেকে হাজার হাজার গণ্ডূষ জল তুলে নিলেও তা অতলান্তই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আলাপ-আলোচনাও ঠিক তেমন। আর তাই আজও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। আমাদের এই সংখ্যায় যেমন বাংলার বাঙালীদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ধরা আছে, তেমনই কিছু প্রবাসীদের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে লেখাও আছে। স্থানভেদে তাঁদের রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে অভিজ্ঞতাও কিছু বৈচিত্র্যময়। আমেরিকার সুজয় দত্ত বা অস্ট্রেলিয়াবাসী সিদ্ধার্থ দের লেখায় সে কথা ধরা পড়েছে। প্রবাসী জীবনে নস্টালজিয়াও জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সিডনীর ইন্দ্রানী দত্তের লেখায় তা ফুটে উঠেছে।

বিদেশীদের চোখে কোথায় আছেন রবীন্দ্রনাথ ? এই প্রসঙ্গে কথা উঠলে রবীন্দ্রসাহিত্য ও তার অনুবাদের আলোচনা এসে পড়ে। আমার সহকারী সম্পাদিকা জিলকে যখন অনুরোধ করলাম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখার জন্যে বা লেখা সংগ্রহ করার জন্যে সে বলল, ‘Ranjita, I have not read enough Tagore to write an entire article on him. Neither do I know anyone who can. Sorry.’ ‘সরি’ জিলের নয়, আমারই বোধহয় হওয়া উচিৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটা তুলে ধরতে পেরেছি বিশ্ববাসীর কাছে ? শুধু বিশ্ববাসীই বা কেন ? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পাঠককুলের কাছে আমাদের প্রাণের কবি কতটা পরিচিত ? রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদের কাজ চলছে বিভিন্ন উদ্যোগে। কিন্তু তার মান ও পরিমাণ কি স্বীকৃতির দাবী রাখে ? বিষয়টি বিতর্কিত জানি। তবে লেখক পাঠক সকলের কাছে অনুরোধ রইল এই বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় ভাবনা চিন্তা করার জন্য। আরও অনুরোধ রইল কেউ যদি রবীন্দ্র-কবিতা, গল্প, গান বা নাটকের অনুবাদ করেন আমাদের পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।

এই সংখ্যায় আমাদের অন্যান্য নিয়মিত বিভাগও আছে। সংখ্যায় কম। কেন বলুন তো ? আমরা প্রস্তুত হচ্ছি আমাদের ঝকঝকে সুন্দর ছাপা সংখ্যাটির জন্য। ঠিক ধরেছেন। সময় হয়ে এসেছে। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সেই সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা আছে। এটি হবে আমাদের তৃতীয় **সংকলন** সংখ্যা। খ্যাতনামা সাহিত্যিক নবকুমার বসু তাঁর নতুন উপন্যাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হবে বাতায়ন ওয়েবসাইটে। দেখতে থাকুন www.Batayan.org. আমাদের এই সংখ্যাটিতে পড়ুন তাঁর নিজের কথায় উপন্যাসটি বিষয়ে তাঁর ভাবনা।

পরিশেষে আবার ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথে। আজকে সারা বিশ্বে পারিবারিক, সামাজিক, ও জাতীয় জীবনের সব স্তরে হিংসার ভয়াল প্রকাশ। বিদ্বেষবিষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানর জন্য অসংখ্য হাতিয়ার মজুত আছে কবিগুরুর লেখায় ও জীবনযাত্রার আদর্শে। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব ! আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে – ।' 'রাত্রির তপস্যা' একদিন নিয়ে আসবেই শুভদিন। ঋষিকবির এই বিশ্বাস আজও আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের দিশার সন্ধান দেয়। এ আলো আবহমান।

'সাময়িক কলরোলে আনো শান্তি শাশ্বত সুরের,

সময়ের সীমা ছাড়ি দৃষ্টি তব হোক সুদূরের।

বিশ্বের গভীর মর্মে উৎসারিত মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী -

সেথা হতে অভয়ের অক্লান্তের মন্ত্র দেবে আনি।'

সকলে ভাল থাকবেন। বাংলা ১৪২৫ আপানাদের আনন্দে কাটুক, শান্তিতে কাটুক 'বাতায়ন' পত্রিকার পক্ষ থেকে এই কামনা জানাই। শুভেচ্ছাসহ,

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
৬ মে, ২০১৮ (ইং)

Acknowledgement

On behalf of Batayan team we want to thank ***Samrat Bose*** *for letting us use the precious book from his father's collection. I also want to acknowledge* ***Sujay Datta*** *from Cleveland, USA for all his support. Special acknowledgement goes to renowned Bengali author* ***Nabakumar Bose*** *for trusting us with his new novel which will be published in sequels.*

সূচীপত্র

কবিতায় রবিস্মরণ

আশ্রয়	মানস ঘোষ	1
কাদম্বিনী ২	পল্লববরণ পাল	2
সে কোন কবি	তপনজ্যোতি মৈত্র	3

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য

কে তুমি তা কে জানত	রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়	5
আপন গান	ইন্দ্রানী দত্ত	6
রবি প্রণাম	পিনাকী গুহ	9
এক অর্বাচীন কলমচি ও উনি	সৌমিত্র চক্রবর্তী	10

কৌতুকভরে স্মরণ

রবিন্ ডোনাট	সুজয় দত্ত	11
শিরোধার্য দাড়ি	স্বর্ভানু স্যান্যাল	15
রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্য: কিছু সশ্রদ্ধ মজলিশি রঙ্গ রসিকতা	সিদ্ধার্থ দে	18

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ	সিরাজুল সালেকিন	22
শিশু, কিশোর, ... রবীন্দ্রনাথের লেখায়	মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	25

গল্পে

বিশ্বকবি	শাশ্বতী বসু	27
গানের ভিতর দিয়ে	শাশ্বতী ভট্টাচার্য	33

অন্যান্য

''হটাবাহার'' উপন্যাস সম্পর্কে	নবকুমার বসু	39
ওপরতলার জানালায়	ইন্দ্রাণী মন্ডল	40
খুঁজতে গিয়ে	স্নেহাশীস ভট্টাচার্য	41
মানো তো দেও, নহি তো পত্থর	ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	42
মায়ের ডায়েরী থেকে	পিয়ালী গাঙ্গুলি	45

আশ্রয়

মানস ঘোষ

ও মশাই, শুনছেন ?
একটু সরে বসুন ।
না না, আপনি নন ।
আপনার ছায়ার কথা বলছি ।
শতাব্দীর বেড়া ভেঙে
কুমোরপাড়া থেকে শুরু করে
কিনু গোয়ালার গলি, সমস্তটাই . . .
আমাদের বড় হয়ে ওঠা,
সহজ পাঠ থেকে, শেষের কবিতা,
সর্বত্রই আপনার ছায়া ।
ছায়া ? নাকি রবির কিরণ ।
প্রেমে পূজায় বিরহে শোকে
আনন্দে আবার চূড়ান্ত হতাশার মুহূর্তে
শেষ আশ্রয় আপনার
আলোকিত অক্ষরমালা ।
কি করে পারেন ? এভাবে নারী পুরুষ
শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার অন্তরের
অনুভূতিকে ভাষা দিতে ।
বড় ঈর্ষা হয় জানেন, যখন দেখি
স্মৃতিভ্রংশতায় তলিয়ে যেতে থাকা বৃদ্ধা মা, সন্তানের জন্মতারিখ ভুলে যান, অথচ
'আজ ২৫ শে বৈশাখ' শোনামাত্রই
ঘোলাটে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,
ছেলের গালে একটা হাত রেখে অস্ফুটে
গাইবার চেষ্টা করেন,
'তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে' . . .
চোখ ভরে আসে . . .

ও মশাই, শুনছেন ?
আরেকটু সরে আসুন ।
পায়ের কাছে একটু বসি ।
সমস্ত অহংকার লীন হয়ে যাক নিশ্চিন্ত সমর্পণে, আপনার আশ্রয়ে ।

মানস ঘোষ । মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

কাদম্বিনী ২

পল্লববরণ পাল

আর কতোবার মরিবে কাদম্বিনী
কতোবার তাকে প্রমাণ করতে হবে
যে সে মরে নাই, অমর সে বাস্তবে
বরং জীবনই তার কাছে চিরঋণী ?

তার গর্ভেই জন্ম এ সভ্যতার
তাকেই অসম্মান করে কালিদাস
সভ্যতা ভরে যাবে কি অসভ্যতায় ?
শুভবোধকে কি গিলে খাবে সন্ত্রাস ?

রোজ পথে ঘাটে ট্রেনের কামরা বাসে
স্কুলে বা কলেজে ভাঙা পাঁচিলের পাশে
আট থেকে আশি কাদম্বিনীর লাশে
মুখপুস্তকে লাইকাই অভ্যাসে

কাদম্বিনীরা যাবজ্জীবন মরে
আমাদের দায় শুধু 'ইশ্' 'মোমবাতি'
এপাশ থেকে ওপাশ শয্যাঘরে
সহানুভূতির অনন্ত খয়রাতি

গল্পটা তুমি ফের লেখো রবিবাবু
এবার তোমার কলম জিতিয়ে দিক
মরবে না আর, বরং কাদম্বিনী
প্রমাণ করবে বেঁচে ওঠাটাই ঠিক

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি — প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ — যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস — একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা — খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

সে কোন কবি

তপনজ্যোতি মিত্র

আজ কবি সৃষ্টি করছেন কবিতা
আঁকছেন ছবি, সৃষ্টি করছেন গান
লিখছেন গল্প আর জীবনের উপন্যাস ।

আজ যেন কবিকে দুরন্ত সৃষ্টির
প্রেরণায় পেয়েছে । কবির ভেতরে বেজে উঠছে
সুমধুর এক ছন্দ ।

সৃষ্টি হল এক অপূর্ব কবিতা, এক অপরূপ ছবি,
এক অসাধারণ গান, এক অবিস্মরণীয় গল্প ।
আর জীবনের এক অনুপম উপন্যাস ।

কবি তাকিয়ে রয়েছেন আকাশের দিকে, প্রকৃতির দিকে,
সুদূর দিগন্তের দিকে, জীবনের মহা ঐশ্বর্য্যের দিকে ।

কবি তাঁর সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন গভীর অনুভূতিতে,
তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল একটি হাসি আর
আনন্দের আভাস ।

সেই অতীত থেকে এখন যদি এসে দাঁড়ানো যায়
এই বর্তমানে
এক যুদ্ধক্ষেত্রে আহত এক সৈনিক
এক হাসপাতালে মৃতপ্রায় এক রোগী
এক লেখক, এক শিল্পী আর
অগণিত সাধারণ মানুষেরা ।
জীবনের কঠিন পর্যায়ে তারা কবির কাছে এসেছিল
যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈনিক পড়েছিল তাঁর কবিতা
রোগীর কানে পৌঁছে ছিল কবির গান
লেখক, শিল্পী, সাধারণ মানুষেরা কবির ছবিগুলো দেখেছিল

কবির গল্প উপন্যাসে পড়েছিল জীবনের বর্ণনা
তাদের আকাশে বেজে উঠেছিল কবির অমূল্য গানের
কথা আর সুরগুলি ।
আর কী আশ্চর্যভাবে তারা জীবনে ফিরে এসেছিল,
তাদের কাছে জীবন হয়ে উঠেছিল কী তাৎপর্যময়,
তারা সৃষ্টির কাছে, অনুভবের কাছে, জীবনের পর্বে
ফিরে গিয়েছিল ।

কবির এক প্রতিকৃতির কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারা
কী উজ্জ্বল, কী গভীর, কী জীবনের বিস্তার
সেই কবির চোখে, মুখে, সারা শরীরে ।
আর একটু মৃদু হাসিতে তাদের সারা পৃথিবী ভরিয়ে দিয়ে কবি
বলেছিলেন
'আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি'
কে বসি পড়িছ ?

"We write long books where no page perhaps has any quality to make writing a pleasure, being confident in some general design, just as we fight and make money and fill our heads with politics-all dull things in the doing-while Mr. Tagore, like the Indian civilization itself, has been content to discover the soul and surrender himself to its spontaneity."

Gitanjali Translation,
Introduction by W.B Yeats,
September 1912

তপনজ্যোতি মিত্র অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির বাসিন্দা । আনন্দধারা'র কুড়ি বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীজাত সম্পাদিত ও বাতায়ন দ্বারা প্রকাশিত দখিনা পত্রিকা থেকে নেওয়া এই কবিতা ।

কে তুমি তা কে জানত

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ সেই কোন ছোটবেলায়। খুব সরল একটা মুহূর্ত্ত। 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। স্বচ্ছ সরোবরের জলে যেন ছোট্ট একটি নুড়ি পড়ল। অল্প একটু জলের কাঁপন, একটা ছোট্ট ছলাৎ শব্দ।

'কাল ছিল ডাল খালি / আজ ফুলে যায় ভরে
বল দেখি তুই মালি / হয় সে কেমন করে ?'

তোমার কবিতায় শিশুমনে আঁকা হচ্ছে রঙবেরঙের ছবি। 'ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয় বেগনী রঙের শাড়ী'।

ক্রমশ বাড়ল পরিচয়ের গভীরতা। তখন তোমার সৃষ্টির বহিরঙ্গ রূপে মুগ্ধ আমি। আচ্ছন্ন আমার চিন্তার আকাশ। তোমার সুর, তোমার শব্দ, ধ্বনি, অলঙ্কার হৃদয়ে তুলল 'বৈশাখী ঝড়'। মনে নামাল 'বেড়া ভাঙার মাতন'।

'ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।'

ক্রমে ঝড় থেমে যায়। হৃদয়ে তখন নতুন উপলব্ধি। বুঝতে পারি 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলে চিত্তাকাশে ফুটে ওঠে তোমার ধ্যাননিমগ্ন মূর্ত্তি। আদি ঋষির প্রথম বীজমন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনি তোমার সৃষ্টিতে। আজ জানি তুমি বিশ্বর্ষি। তোমার সৃষ্টিতে মিশে আছে বিশ্বস্রষ্টার আনন্দামৃত। তোমার গানের সুরে তাই 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' আমি অঞ্জলি ভরে পান করতে চাই সেই আনন্দসুধা। হে আদিকবি ! আমিও মৃত্যুঞ্জয়ী হতে চাই তোমার রচনার মতো।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

আপন গান

ইন্দ্রানী দত্ত

শব্দে শব্দে বিয়া হয়, সুর বসে, গান জন্মে । কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে, থিতু হয়, বসত করে । সুখে সঙ্গ দেয়, দুঃখে হাত ধরে । সে গান বুকের গান । আপন গান । সময়ের পলির তলে তলে গানের ফল্গুধারা — কোন মুহূর্তে কখন সে আসে, ঘর বাঁধে বুকে, কখন আবার হারিয়ে যায়, বুকে চমক দিয়ে হঠাৎ ফিরে আসে কিম্বা ধুয়ার মত ফিরে ফিরেই আসে সারাজীবন . . .

সে বড় সুখের সময় ছিল না । বাতাসে বারুদের গন্ধ মেলায় নি তখনও । সদ্যোজাত বাংলাদেশ । বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ মস্তক হারাচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে । আমাদের শহরতলীতে শিশুরাও পরিচিত বোমা, পাইপগানের গঠনে । নিষিদ্ধ শব্দরাজিতে যুক্ত হচ্ছে পার্টি, লাশ, নকশাল এবং চারুবাবু । স্কুল যাওয়ার পথ জুড়ে উদ্বাস্তু ভিখারিণী, যাতায়াতের পথে বাসে থ্যাঁতলানো কুকুর, রেললাইনের পাশের বস্তি, কুমোরটুলির খড়ের কাঠামো, নিষিদ্ধধ্বনিমাধুর্যে পূর্ণ অজস্র দেওয়াল লিখন । নিতান্ত অনলৌকিক । শৈশব হারিয়ে ফেলার কাল সে সময় । ঠিক সে সময়েই আমাদের ইশকুলের প্রেয়ারহলে একটি শব্দবন্ধ আমার হাত ধরে — 'বিকচকমলাসনে' । লাইনটি মাথায় পাক খায় সর্বক্ষণ — 'তুমি যদি থাকো মনে, বিকচকমলাসনে /।। তুমি যদি দুখ পরে রাখো কর স্নেহভরে, তুমি যদি সুখ হতে দন্ত করহ দূর' । অলৌকিক শব্দবন্ধ, ততোধিক অলৌকিক বাক্যের গঠন, ধ্বনিমাধুর্য-শব্দ-বাক্য-সুর-গান । রবীন্দ্রনাথের গান । আপন গান । নিষিদ্ধ শব্দরাজি পিছু হটে যায় ।

ক্রমে আমাদের শৈশবে ঢুকে পড়ে কালো চাকতিগুলি — থার্টিথ্রী, ফর্টিফাইভ, সেভেন্টিএইট — রাখাল ছেলেটি বাঁশি হাতে অথবা প্রভুর স্বর শোনা ভক্ত কুকুরটি কালো চাকতিতে ঘুরে চলে । কখনও রত্নাকর গাইছে — '. . . . দেবী গো, চাহি না, চাহি না মণিময়ধুলি রাশি চাহি না . . . যে বীণা শুনেছি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর' . . . অথবা চন্ডালিকা গেয়ে উঠছে 'আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে জল দাও, জল দাও, জল দাও', কিম্বা মধুশ্রী . . . 'যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা', কখনও শান্তা — 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আখিজলে' । আর বজ্রসেন — 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজনশরণপ্রভু' । কিছু বুঝি, কিছু না বুঝি, বুকের ভেতর কিছু একটা হয় — আপন গান জন্ম নেয় । এইভাবে । ঠিক এইভাবে ।

এল পির কাভারে বাহারি শাল গায়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তীক্ষ্ণনাসা সাগর সেন গাইছেন 'ঐ তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়, শিথিলকবরীতে তোমার লও না তুলে', ট্রেমেলোটুকু বাদ দিলে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় যেন রূপকথার রাজপুত্র, দুই সুদর্শনা সুচিত্রা, কণিকায় মোহাবিষ্ট আমরা শৈশবে, কৈশোরে । সামান্য আড়ালে চলে যাচ্ছেন প্রচারবিমুখ নীলিমা সেন, অথবা অর্ঘ্য সেন, সুবিনয় রায় — চশমা চোখে, বিরল কেশ, মৃদুকণ্ঠ । কণ্ঠমাধুর্য, রূপ, গ্ল্যামারে হয়ত সামান্য ব্যাহত হচ্ছে সেই সময়ে আপন গানটি বেছে নেওয়া ।

সত্তরের মাঝামাঝি টেলিভিশন আসে । সাদা কালো । ঝিরিঝিরি পর্দা । রবিবারের বাংলা সিনেমা আর বৃহস্পতিবারের চিত্রমালা — 'বিভাস' সিনেমায় উত্তমকুমার গাইছেন, 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে', অথবা 'চৌরঙ্গী' তে 'এই কথাটি মনে রেখো' র সঙ্গে ঝরা পাতার দৃশ্য, কিম্বা 'বিকেলে ভোরের ফুলে' ডুয়েটে 'আমার সকল রসের ধারা' ।

'একটুকু ছোঁয়া লাগে' তে বিশ্বজিৎ বাগানে গাইছেন, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়-হাওয়ায় উড়ছে অ্যালবার্ট কার্ট', অথবা 'নিমন্ত্রণে' টিলায় বসে নন্দিনী মালিয়া 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' — 'কুহেলী'র অমোঘ ডুয়েট 'তুমি রবে নীরবে', বিশ্বজিৎ আলতো চিবুক ছোঁয়াচ্ছেন সন্ধ্যা রায়ের হাতে — 'দৌড়' এ স্বপ্নদৃশ্যে মহুয়ার ক্রাচ উড়ে যায় 'হা রে রে রে রেরে'র সঙ্গে — 'বিচারক' এর গ্রীনহাউসের জলধারার মাঝে অরুন্ধতী গাইতে থাকেন 'আমার মল্লিকাবনে' — 'যদি জানতেম'এ

পঙ্কু রমা শোনান, 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' — 'আরোগ্যনিকেতনে' রেডিওতে বাজে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' — 'ঠগিনী'তে অনুপকুমার তুলি হাতে গাইছেন 'যৌবনসরসীনীরে' — 'নীল দিগন্তে'র সঙ্গে মাথায় স্কার্ফ, চোখে গোগো গগল্‌সএ কাবেরী বসু 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'তে। 'শঙ্খবেলায়' বৃষ্টিস্নাত মাধবী আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে শুরু করছেন 'জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে' মন লাগে না'। ''মেঘে ঢাকা তারা'য় 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি'র ইন্টার্ল্যুডে কালপেঁচার ডাক — 'কোমলগান্ধার' এ 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'র সেই আর্তি। সেই অর্থে অপ্রচলিত 'আমার মন বলে চাই চাই গো' আর 'কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়' কাছে চলে আসে 'আকাশকুসুম' এ।

সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না হয়েও কখনও ধ্বনিমাধুর্য্যে, কখনও প্রিয় গায়ক, অভিনেতা বা চিত্রদৃশ্যের হাত ধরে গানগুলি অবিরাম ঢুকে যেতে থাকে অন্তরমহলে, আপন গান হয়ে ওঠে ক্রমশঃ।

পরিণত যৌবনে আপন গান তৈরী হতে থাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, মুহূর্তে। নানা দৃশ্যকল্প জড়িয়ে যেতে থাকে গানের সঙ্গে। সদনে কিশোরী গায়িকার সঙ্গে হয়তো চিরকালের মতো মিশে রইল 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে'; সারাজীবন ধরে ধুয়ার মতো ফিরে ফিরে এলো '. . . বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন তোমারি লাগি', সঙ্গে হালকা গোলাপী সালোয়ার কামিজে সেই কিশোরী। ঘনঘোর বর্ষণে, শিশির মঞ্চে স্বাগতালক্ষ্মী গাইছেন 'কেন এলি রে' আর দর্শকাসনে মেয়েটি ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে 'ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে' . .'র সঙ্গে — কিম্বা ট্রেনে দরজায় হেলান দিয়ে ক্লান্ত যুবক গাইতে থাকেন, 'এ, মোহ আবরণ খুলে দাও' — নতুন প্রতিবেশীর জানলা দিয়ে আচমকা ভেসে আসে 'ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে' — মৃত্যুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রিয় গায়িকা গেয়ে ওঠেন 'তুমি কিছু দিয়ে যাও'। সদ্য পিতৃহীন কিশোরী আকাশপানে মুখ তুলে গায় 'এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে'।

যে গান, যে গায়ক শৈশবে, কৈশোরে আকর্ষণ করে নি, যৌবনে সেই গান, সেই গায়ক ক্রমে প্রিয় হয়ে ওঠে। রেডিওতে রবিবার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার আসর। 'এই শ্রাবণবেলা বাদল-ঝরা' শেখাচ্ছেন সুবিনয় — রবিবারের সকালে ট্র্যানজিস্টারে ভেসে আসছে অদ্ভূত মায়াবী উচ্চারণ — 'কোন ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনিচিনি' — সুবিনয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল। সেই প্রথম। আমাদের বয়স বাড়তে লাগল, মায়েদের চুল রুপোলি — আমরা খুঁজে পেলাম মায়েদের দিনলিপির ছেঁড়া পাতা, হলদে হয়ে যাওয়া চিঠিপত্র, ন্যাপথালিনের গন্ধময় পাটকরা ওভারকোটের পকেটে প্রাচীন লবঙ্গ আর এলাচি।

ক্রমে আমরাও মা হয়ে যাই আর সুবিনয়ের প্রেমে পড়ি প্রবলভাবে। ঐ নরম মেদুর মায়াবী কণ্ঠ আমাদের আচ্ছন্ন করে। ৪৫ আর পি এম অথবা শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ জোগাড় করি আর আবিষ্কার করতে থাকি সুবিনয়ের কণ্ঠস্বর কি অদ্ভূত ভরাট হয়ে গিয়েছিল আশির দশকে। নব্বইতে আবার সেই মেদুর নরম গলা — নির্জন দুপুরে বিপণি চত্বরে ক্যাসেটের দোকান থেকে ভেসে আসছেন সুবিনয় — 'তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে'। অথবা 'হাজার লোকের মাঝে/ রয়েছি একলা যে ।।। এখনো কেন সময় নাহি হল / নাম-না-জানা-অতিথি' — সুবিনয় ভিন্ন তখন আমাকে আর কেই বা কাঁদাতে পারেন ?

শ্রাবণের আকুল বিষণ্ন সন্ধ্যার সঙ্গে সুবিনয় রায় অঙ্গাঙ্গী হয়ে যান ক্রমশঃ; 'যেদিন ফুটলো কমল' এ গীতা ঘটক-কে পুনরাবিষ্কার করি। এবং রমা মন্ডল।

সেই অর্থে রমা মন্ডলের ভক্ত কোনদিনই নই, ছিলাম না। 'যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়া গীত' 'নমি নমি চরণে' মোড়কবন্দী হয়েই ছিল বহুদিন। রবিবারের এক দুপুরে, একা বাড়ীতে রান্না করতে করতে মোড়কটি খুলি। প্রথম ছয়খানা গান সম্বন্ধে সেভাবে বলার কিছু নেই। নমি নমি চরণে, বরিষ ধরা মাঝে, আমার যা আছে, হে মহাজীবন এবং চিরসখা শুনতে শুনতেই ডালে সম্বার, মাছের ঝোলে হলুদ দেওয়া আমার।

সপ্তম গানখানি — 'ঘাটে বসে আছি আনমনা।' এর আগেও কতবার কতজনের গলায় শুনেছি, কিন্তু সেদিন — ডালে পোড়া লাগল, মাছের ঝোল শুকিয়ে গেল, স্টোভটপে ছড়িয়ে রইল হলুদগুঁড়ো, ধনে, জিরে।।।

এই অতি সাধারণ চারখানি লাইনেও এত বৈরাগ্য ভরা ছিল —

তীর-সাথে হের শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান —

রশি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

এর পর থেকে সিডির বাকি গানগুলির অদ্ভুত আবেদন এক — খেলার সাথি এবং তুমি জানো ওগো অন্তর্যামীর পরে আমার পরাণ যাহা চায় আর তার পরেই যে রাতে মোর দুয়ারগুলি — এই কম্বিনেশনে, আমার পরাণ যাহা চায়-এর মত বহুশ্রুত প্রেমের গান অন্য মাত্রা পায় — আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন উচ্চারণ করেন রমা, আমি মৃত্যুর আবাহন শুনি।

এর পরে একে একে আসে আরো পাঁচখানি গান। বরণমালা হাতে ভুবন দাঁড়িয়ে থাকে, গগন আমার জন্য লক্ষ প্রদীপ জ্বালায়, প্রেম জেগে থাকে — তারপর সব ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যায় — রমা গেয়ে ওঠেন — 'মরণ বলে, আমি তোমার জীবনতরী বাই।' এভাবেই কখন বহুশ্রুত গান হয়ে ওঠে আপন গান। এবং কখনও পূর্ণ গানটিও নয় — একটি দুটি চরণ। 'নাই যদি বা এলে তুমি'-তে 'বিরহ মোর হোক না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে মিলনকমল উঠছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউএর পরে' চরণগুলি বড় নিষ্প্রাণ ঠেকে, গানের থেকে সরে যায় মন। তখনই বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে আসে অমোঘ চরণ — 'তবু তৃষায় মরে আঁখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি / চোখের 'পরে পাবো না কি বুকের 'পরে পাই বলে'। মুহূর্তে গানটি আপন গান হয়ে ওঠে।

আমাদের বয়স বাড়ে।

মণিপুর আসে, আসে বেসলান, সাগর পাখির ডানা ভারী হয় কৃষ্ণতেলে, লাল জামা পরা তিন বছরের খোকা আলান কুর্দি মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বালিতে — সমুদ্র গর্জন করে। আসে বন্ধুবিচ্ছেদ, ভোরের টেলিফোনে প্রিয় মানুষের চলে যাওয়া। তীব্র যন্ত্রণার মুহূর্তে আপন গান সঙ্গ দেয় না আর, যদিও তেমন কথা ছিল না।

হঠাৎ আবিষ্কার করি প্রবাসী বালিকাকে, পরের প্রজন্ম — ঘুরে ঘুরে গাইছে 'আমার পরাণ যাহা চায়'। বারে বারে উচ্চারণ করে চলে 'আমার পরাণ আমার পরাণ'। সেই বিকচ কমলাসন' এ মুগ্ধ হওয়ার মতো।

সেই বয়স, সেই বাক্যবন্ধে অপার মুগ্ধতা।

ফিরে আসে।

ফিরে ফিরে আসুক।

ইন্দ্রাণী দত্ত — সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

রবি-প্রণাম

পিনাকী গুহ

প্রথম জীবনে

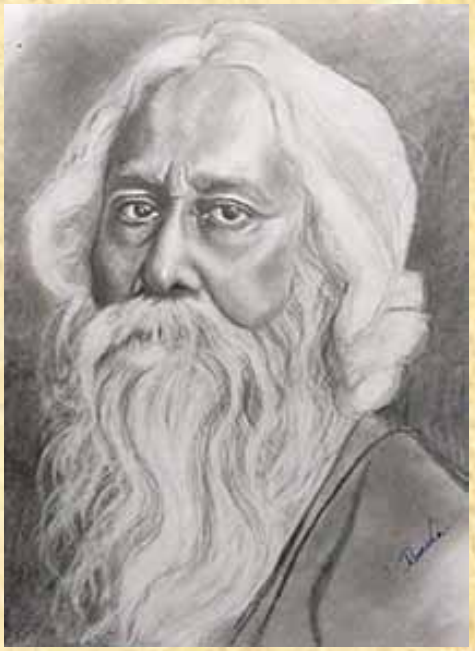

রবির কিরণ মেখে স্কুলে ছুটতাম ধুলো পায়ে। হারমোনিয়ামে, নাট্যমঞ্চে, ফুলের মালায় ভরপুর রবির গন্ধ। সেই গন্ধ গায়ে মেখে সমস্ত ছেলেবেলা জুড়ে ভাসিয়েছি কেয়াপাতার নৌকা। তারপর দিনেদিনে গোকুলে বেড়েছে চারাগাছ। বেড়েছি সবুজ আবেগে, মেতেছি পূর্ব রাগে। কখনো ছারখার হয়েছি আত্মীয় বিয়োগে। সিঁদুরে মেঘে প্রমাদ গুনেছি কতবার। এরই মধ্যে কুড়িয়েছি তোমায় — কফিশপে, সমুদ্রতীরে। যখন যেমন চোখে পড়েছে। সে সব কখনো কাঁপিয়ে দিয়েছে, ডালপালা, কখনো আবার ছুঁতে পারিনি। চুপচাপ ধূপ জ্বালিয়ে সরে গেছি নিঃশব্দে। ফিসফিস করে বলেছি,

''দোষ নিও না গুরুদেব।''

মধ্য জীবনে

লক্ষণ রেখার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি অবনত শির। চারিদিকে বেড়া বাঁধা। বেড়ার বাইরে — আমার পাড়ার চৌমাথায় রক্ত আর দস্যুতা। আমার ভিতরে ঈর্ষা আর দ্বেষ। আমার রক্ষক আজ আতঙ্ক আর হিংসা ছড়ায়। চটকা ভাঙ্গে তোমার ছবি দেখে, কে যেন সুন্দর করে মালা পরিয়ে দিয়েছে। তোমার জন্মদিনে আজ সুললিত ভাষণ, খাতা খুলে গান, স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছে ঢুলু ঢুলু চোখে। সমাজ মাধ্যমে, চতুর ফোনে, রেস্তোরাঁর নীল বাতিতে ঝকমক করছ তুমি। দেখছ আমাদের অনর্গল আত্মপ্রচার, অসহিষ্ণুতা, বিকৃত দেশপ্রেম। তবু বিষ পান করে সন্ধ্যে কাটে ভালোমন্দে। মগজে কারফিউ নিয়ে ফোনের নীল আলোয় উঁকি মেরে সময় দেখি — ''এখন রাত কত হইলো ?''

শেষ জীবনে

নির্জন নিঃসঙ্গতায় ভাঙতে ভাঙতে ক্রমশ টের পাই - আর বেশিদিন থাকব না। আর অফুরান নেই রবি কিরণ। তাই যা পারি শুষে নিতে থাকি। কিছুটা রবিকণা যদি দিয়ে যেতে পারি নবীন চারাগাছগুলিকে। যেগুলি ছড়িয়ে পড়বে ভুবনডাঙার প্রান্তে প্রান্তে, বিশ্ব জুড়ে। হয়তো সেগুলোই বড় গাছ হয়ে সহিষ্ণুতার ছায়া দেবে, রুধবে বেনোজলের সুনামি। ''শুভ কর্মপথে গাইবে নির্ভয় গান''। সেই সাধ নিয়েই জীবতারা খসে পড়বে একদিন। তারপর মহাসিন্ধুর ওপারে তোমায় যদি পাই শুধু বলব ''চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে''।

পিনাকী গুহ — জন্ম দক্ষিনেশ্বর। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। কর্মসূত্রে চেন্নাই, কলকাতা, মুম্বাই থেকে পাড়ি মার্কিন মুলুকে। অধুনা বৃহত্তর শিকাগোর বাসিন্দা। স্ত্রী পৌলমী ও একমাত্র পুত্র প্রমিতকে নিয়ে চলে সংসারের আঁকিবুকি। এরই মাঝে নেশা আড্ডা, অসময়ে ঘুম আর লেখালিখি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রটি এঁকেছেন রীমিকা কর

এক অর্বাচীন কলমচি ও উনি

সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী

লিখেতে পারে এমন সব বাঙালীই বোধহয় ওনাকে নিয়ে লিখেছেন, একমাত্র আমি ছাড়া। প্রবন্ধ তো কোনওকালেই নয়, কবিতাও নয় তেমন, ডায়েরীর পাতাতেও খুব একটা এসেছেন কি ? মনে পড়েনা। এদিকে মানুষটিতো প্রায়শঃই চলে – ফিরে বেড়ান চিন্তনে-মননে, যতই বেসুরো হোক ইচ্ছা হলেই এসে বসেন গলায়, আবৃত্তি হয়ে ঝরেন ওনার কবিতায়। বছরে চারবার শান্তিনিকেতন চলে যাচ্ছি, রোজ দু'বেলা ওনার ছবির সামনে দাঁড়াচ্ছি, যখন-তখন ধার করছি ওনার দর্শন, তবুও একটা লেখাও নয় আজ অবধি ? কেন ?

উনি বহুচর্চিত বলেই কি নিজের কলমে নতুন ভাব-ভঙ্গির অভাব প্রকট হয়ে ওঠে ? নাকি অমন একটা আকাশ-সমুদ্দুর মেলানো বিশাল ব্যক্তিত্ব আমার বোধের নাগালের বাইরে ? আচ্ছা, এমন নয়তো যে একটাই অন্তরতম যে আলাদাই করতে পারছিনা। কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? অতই যদি আত্মস্থ করে ফেলব, অতই যদি এলেমদার, তবে দুঃখ এলে এত গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাই কেন ? কেনই'বা এত বিচলন পায়ে-পায়ে ? মনে এত দ্বেষ, ক্ষোভ, এমনকি একটু-আধটু হিংসাও ? কই উনি তো এমন ছিলেন না। উনি তো বলে গিয়েছেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সে পাপ কেন রোজের পায়ে পায়ে ? কেনই'বা পরবর্তী প্রজন্মকে যন্ত্র বানানোয় ব্যস্ত এটা জেনেও যে ওনার জোর ছিল প্রকৃত ও প্রকৃতির উপর ?

সত্যি বলতে কি এর কারণ খুঁজে বের করা ভারী মুশকিল। হয়তো তেমন কারণই নেই কোনও, থাকবার মধ্যে আছে নেহাৎ সর্বার্থে সীমাবদ্ধতা। তাই-ই বোধহয়। না হলে যে মানুষটা ''কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি'' থেকে শুরু করে রাতের তারাদের দিনের আলোর গভীরে থাকবার সুলুক দেন, তাঁকে নিয়ে লেখালেখিতে এত দুর্ভিক্ষ কেন ? জানিনা। কলম, তুমি জানো ? নাকি তুমিও অর্বাচীন কলমচির মতোই ?

'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
হৃদয় ভরে বান
আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে
রবিঠাকুরের গান।
রবিঠাকুরের গান ওরে ভাই
রবিঠাকুরের ছবি
ঘরে এবং ঘরের বাইরে
যখন একলা হবি।'

রবিঠাকুরের ছড়া
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সৌমিত্র চক্রবর্তী। পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

রবিন্ ডোনাট্

সুজয় দত্ত

বাড়ীর অদূরেই বার্নস্ অ্যান্ড নোব্‌লের যে বড় বইয়ের দোকান, তার ভেতরে কোণার দিকটায় কফি-সম্রাট স্টার্‌বাক্স্-এর অস্তিত্ব এই সেদিন অবধি নজরেই পড়েনি আমার । যখন পড়ল, আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করে পুলকিত হলাম । স্টার্‌বাক্সের মাথার ওপরের দিকটায় দেয়ালের গায়ে শেক্স্‌পীয়ার, শেলী, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, হুইট্‌ম্যান্, ফ্রস্ট, মার্ক টোয়েন, হেমিংওয়ে ইত্যাদি সাহিত্যজগতের নক্ষত্রদের ছবি একের পর এক, আর তার মাঝে স্বমহিমায় বিরাজমান এক অতি-পরিচিত দাড়িওয়ালা মুখ । সেই কোন্ ছোটবেলায় সহজপাঠের মলাটে প্রথম মোলাকাত তাঁর সঙ্গে । সামনের কাউন্টারে বিরামহীন বিকোচ্ছে কাপুচিনো, চায়ে-লাটে, মোকা, এনার্জি-বার, বিস্‌কটি আর ডোনাট । তিনি সারাদিন ধরে অপলক, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কেবল দেখে চলেছেন সেই নিরন্তর বিকিকিনি । হঠাৎ দু-দশকেরও বেশী আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার ।

তখন সবে এসেছি আমেরিকায় । চারপাশের সবকিছু দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাওরার পর্ব তখনও চলছে । এখানকার পরিকাঠামো, সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান, মানুষের কর্মসংস্কৃতি ও কর্মদক্ষতা — সবকিছুর সঙ্গে অনিবার্যভাবে নিজের দেশের তুলনা চলে আসছে মনে মনে, আর ভাবছি, এ কোথায় এলাম ! স্বভাবতঃই ইউনিভার্সিটিতে আমেরিকান সহপাঠীদের সম্বন্ধেও একটা অজানা সমীহ ছিল — না জানি এরা কী হবে! সারা বিশ্বের সব খবর নিশ্চয়ই এদের নখের ডগায় । হয়তো পুঁইশাক চচ্চড়িতে পাঁচফোড়ন দেয় না সর্ষেফোড়ন অথবা ল্যাংড়া বেশী মিষ্টি না হিমসাগর — সেসবও অজানা নয় । সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কথা যে জানবে — এ তো ধরেই নেওয়া যায় । সেই বিশ্বাসেই ওদের একজনকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, 'You are familiar with Rabindranath, right?' সে খানিক ভেবে-টেবে উত্তর দিল, 'Is it one of those nationwide chains, like Dunkin Donut?'

সেদিন হতাশ আর বিস্মিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ও এক অর্থে ভুল বলেনি । রবীন্দ্রনাথ তো একটা nationwide chain বা দেশজোড়া শিকলেরই নাম, যাতে বাঁধা পড়ে আছে বস্টন থেকে সান্ ডিয়েগো, মায়ামি থেকে সীয়্যাট্‌ল্ — সমগ্র আমেরিকার প্রবাসী বাঙালীরা । এ-বাঁধন হৃদয়াবেগের আর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার, যা 'পরতে গেলে লাগে' না, কিন্তু 'ছিঁড়তে গেলে বাজে' । যাইহোক, তারপর থেকে আমরা, ইউনিভার্সিটির বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা পচা ডোনাট দেখলে বলতাম 'রথীন্দ্রনাথ' (rotting donut) বা কেউ বিনিপয়সায় ডোনাট খাওয়ালে তাকে বলতাম 'দেবেন্দ্রনাথ' ।

জোড়াসাঁকোর নোবেল-লরিয়েট্‌কে নিয়ে টুকরো টুকরো মজার ঘটনা ছড়িয়ে আছে আমার সারা জীবন জুড়েই । তখন সবে প্রাইমারী স্কুলে ঢুকেছি । 'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'আমাদের ছোটনদী' আর 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'-এর স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বইয়ের পাতায় । তবে দেওয়ালে টাঙানো তাঁর ছবি দেখলেই কেন লোকে কপালে হাত ঠেকায় আর মে মাসে আমার জন্মদিনের কাছাকাছি সময়ে কেন প্রতিবছর পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল বেঁধে, মাইক বাজিয়ে তাঁর ছবিতে ফুলমালা দেওয়া হয় — সেটা পরিষ্কার হয়নি । বড়রাস্তার ধারে কালীমন্দির বা চৌমাথার মোড়ে শীতলামন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকে পেন্নাম ঠোকে দেখেছি, আর অক্টোবরে পূজোর মরশুমে তো চারিদিকেই প্যান্ডেল-মাইক-আলোকসজ্জা । তাহলে কি এইজন্যই তাঁকেও 'ঠাকুর' বলা হয় ? যাইহোক, এইসময় এক ফাল্গুন মাসে আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় মামাতো দিদির বিয়ের ঠিক হল । আমরা অর্থাৎ কচিকাঁচার দল জীবনে এই প্রথম এরকম বড় অনুষ্ঠান দেখছি — পদে পদে বিস্ময় । মামাবাড়ীর ছাদ, উঠোন আর পাশের মাঠ লাল-সাদা কাপড়ের প্যান্ডেলে ঘিরে ফেলল ডেকরেটার, রেকর্ড প্লেয়ারে বিস্‌মিল্লাহ্ খানের সানাই, গাদা গাদা চেয়ার আর সরু সরু টেবিল জড়ো হচ্ছে মাঠের এক কোণে, আর ছাদে বসেছে ভিয়েন । দুটো রোগা-রোগা চেহারার লোক ডেকরেটারের ম্যাটাডর ভ্যানটায় করে বাজার এনে দরজায়

দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়তে লাগল, 'রবিঠাকুর, ও রবিঠাকুর, মাল এসে গেছে' । শুনে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল ময়লা-ময়লা রঙের একটি লম্বাচওড়া লোক, মাথায় টিকি । আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছিনা — এ কী করে রবিঠাকুর হয় ? গালে দাড়ি কই ? তাছাড়া বাড়ীর বড়রা তো একে দেখে পেন্নাম ঠুকছে না ! রীতিমতো রাগত গলায় কৈফিয়ত চাইছে, 'রবিঠাকুর, দুপুরবেলা যে পঞ্চাশটা পাত পড়বে, এখনো রাধাবল্লভী আর আলুর দম হয়নি ?' বা 'রবিঠাকুর, কমলাভোগের ছানাটা ছানার ডালনায় দিয়ে দিলে, এখন মিষ্টিটা হবে কী দিয়ে ?' অনেকক্ষণ এই নিয়ে ধন্দে থাকার পর এক মাসীর কাছে শুনে আশ্বস্ত হলাম যে, লোকটি একজন উড়িয়া রাঁধুনি, নাম রবিশংকর বেরা, ভিয়েনের হেড্-কুক । পৃথিবীর সব রবিঠাকুরের কাজ ছড়া লেখা নয় ।

আমার মামাবাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই এক যুবক থাকতেন যাঁর ভালনাম আজ আর মনে নেই, কারণ আমরা ছোটরা তাঁকে সবাই ডাকতাম খোকাদা বলে । বয়সে অনেক বড়, কিন্তু পাড়ার অল্পবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই মিশতেন । দুটো বাড়ীর মাঝে যে একফালি জমি, সেখানে জমিয়ে ক্রিকেট-ফুটবল খেলতেন তাদের সঙ্গে । মজার মজার কথা বলে হাসাতেন । চা-সিগারেটের নেশা তাঁর দেখিনি কখনো । নেশা ছিল অন্য জিনিসের । তিনি ছিলেন যাকে বলে রবীন্দ্রপাগল — রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা যে তাঁর মুখস্থ ছিল, গুনে শেষ করা যাবেনা । ওঁর কোন্ এক জাহাজে কাজ করা আত্মীয়ের কাছে উপহার পাওয়া বিদেশী টু-ইন্-ওয়ানে রেকর্ড করে রাখতেন নিজের আবৃত্তি । ক্যাসেট্ রেকর্ডার বা ক্যাসেট্ প্লেয়ার বাণিজ্যিকভাবে তখনো বাজারে আসেনি, তাই ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ অভিনব ছিল । শুধু আবৃত্তি নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্যারোডিও মন্দ গাইতেন না খোকাদা । একদিন মামাবাড়ীতে সন্ধ্যেবেলার আড্ডায় এসেই আমার মামীকে বললেন, 'ও জ্যেঠিমা, এক্ষুণি অফিস থেকে ফিরেছি, খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়ান'। বলেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ মজারু ভঙ্গীতে গান ধরলেন, ''আনো চমচম হে \ সাথে ফুলুরি ও পিঁয়াজি \ খিদে চনচনে হে \ তুমি রেঁধেছ গো কী আজি ?'' এই প্যারডিটা এমনভাবে আমার মনে গেঁথে ছিল যে, অনেক পরে রেডিওতে সকালবেলার স্থানীয় সংবাদের শেষে একদিন আসল গানটা শুনে তবে ভুল ভাঙল । যাইহোক, এহেন খোকাদা একবার এক কান্ড করেছিলেন । তখন ঐ পাড়ায় একটাই মিষ্টির দোকান ছিল — পরেশ মিষ্টান্ন ভান্ডার । সে-দোকান কোনোরকমে টিমটিম করে চলত, অনেক সময়েই সেখানে সাধারণ মিষ্টি বা সস্তা খাবারও চাইলে পাওয়া যেত না, যেতে হত সেই বড়রাস্তার মোড়ে মা লক্ষ্মী সুইট্সে । পাড়ার লোকে খুব বিরক্ত ছিল মালিকের ওপর । দরকারের সময় কিছু কিনতে গেলেই দেখা যেত বাইরে বোর্ড টাঙানো — এটা নাই, সেটা নাই । এক সন্ধ্যেয় বড়মামার বন্ধু রাজামামা এসে উত্তেজিত স্বরে বললেন, ''ব্যাটা ময়রার পো-র এদিক নেই ওদিক আছে । কবে দোকানের গণেশ উল্টে যায় তার ঠিক নেই, আবার বাইরের বোর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখে রাখা হয়েছে ! দাঁড়াও, মস্করা বার করছি হতচ্ছাড়ার — ।'' আসলে উনি ওখানে খাস্তা কচুরি কিনতে গিয়ে যথারীতি ব্যর্থ হয়ে চলে আসবার সময় খেয়াল করেন বাইরের বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা, 'নাই, রস নাই, দারুণ দহন বেলা \ হের তব নীরব ভৈরব খেলা ।' পরে জানা গেল ওটা ময়রার কীর্তি নয়, খোকাদার । অফিস থেকে ফেরার সময় বোর্ডে দেখেন 'কচুরি নাই, রসগোল্লা নাই' । বোধহয় 'কচুরি' আর 'গোল্লা' কথাদুটো একটু মুছে গিয়েছিল । বাকীটা দেখে আইডিয়াটা মাথায় আসে — পরের লাইনদুটো লিখে দেন ।

একটু আগে রেডিওতে 'কলকাতা ক'-এ সকালের খবরের পর রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বলছিলাম । সেটা যে বয়স থেকে শুনে আসছি বাড়ীতে, তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত কী বস্তু — তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা । শুধু দেখতাম মাঝে মাঝে একজন আমাদের স্কুলের হেড্মাস্টারমশাইয়ের মতো ভরাট, ভারিক্কি গলায় গান গাইলে বাবা বাজারে যাওয়ার আগে থলি হাতে রেডিওর সামনে খানিকক্ষণ চোখ বুজে পায়চারী করতেন । আর হেড্মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেলে ক্লাস টেনের ছাত্রীর যেরকম অবস্থা হয়, সেইরকম কাঁদোকাঁদো গলায় এক ভদ্রমহিলা গান গাইলে মা তাঁর রান্নাঘরের নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততা থেকে কয়েক মিনিটের বিরতি নিয়ে ঘরে রেডিওর সামনে পাখার তলায় এসে বসতেন । এই গায়ক-গায়িকার নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম জর্জ বিশ্বাস আর মোহর ব্যানার্জী । এ আবার কেমন নাম ? ভদ্রলোক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নাকি ? আর ভদ্রমহিলার নামটাও কেমন যেন 'টাকা চৌধুরী' বা 'পয়সা মিত্র'-র মতো শুনতে । যাইহোক, এর বেশ কয়েকবছর পরে কলকাতায় একবার হিড়িক উঠল, 'পল্টু আসছে, পল্টু আসছে' । অর্থাৎ পোপ দ্বিতীয় জন্ পল্ কলকাতা সফরে আসছেন । বিরাট ব্যাপার। সেই সফরে পোপ আরেকজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তাঁর গান শুনেছিলেন।

এই ভদ্রমহিলার বলিষ্ঠ, দৃপ্ত কণ্ঠস্বর আর গায়কী আমার খুব ভাল লাগত। আজও লাগে। বিশেষতঃ একটা গান এখনও বারবার শুনি – 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। এই গানটি আমি ঐ গায়িকার সঙ্গীতগুরুর (অর্থাৎ শ্রী শান্তিদেব ঘোষের) গলায়ও শুনেছি, কিন্তু ওঁর গলায় আরও বেশী মনোমুগ্ধকর লাগে।

আমি যখন ক্লাস টেন্-এ, শুনলাম আমার মা-র স্কুলের সহ-শিক্ষয়িত্রীরা আমাকে জন্মদিনের উপহার হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা রেকর্ড দেবেন ঠিক করেছেন। আমি মনে মনে হতাশ হলাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা তখন কিছুই বুঝতাম না (আর গল্প-উপন্যাস তো 'ওসব বড়দের জিনিস' বলে পড়তেই দিতেন না অভিভাবকরা)। মাকে দু-একবার বলার চেষ্টা করলাম, আরো কত কীই তো রয়েছে – হেমন্ত-মান্না-শ্যামল-কিশোরের গান – একটু অন্য কিছু দেওয়া যায়না ? মা বকুনি দিলেন – উপহার পছন্দ হবেনা, বদলে দাও – এরকম বলা যায় নাকি ? তো সেই সাড়ে-তেত্রিশ স্পীডের লং-প্লে রেকর্ড শেষ অবধি যখন হাতে পেলাম, আমি অবাক। এ কোন্ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ? সাহিত্যিক ভদ্রলোকের ছবির সঙ্গে তো মিলছে না ! তাছাড়া রেকর্ডের খাপের ছবিতে এঁর সামনে রয়েছে একটা লম্বামতো ইলেক্ট্রিক গীটার ! গীটারবাদক সুনীল গাঙ্গুলীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। ওই রেকর্ডে ওঁর বাজানো রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের মূর্চ্ছনা আজও কানে বাজে। 'তুমি রবে নীরবে', 'আমি চঞ্চল হে', 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার', 'দুজনে দেখা হলো মধুযামিনী রে', আরো কত কী। তারপর থেকে এখন অবধি ওঁর যাবতীয় ক্যাসেট্-সিডি আমার সংগ্রহে। শুধু তাই নয়, আরো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর এগারো ক্লাসের পড়া শুরু হবার আগে যে ফাঁকা সময়টা, তখন হাওয়াইয়ান গীটার শিখব আমি। অবশ্য এর পিছনে অন্য প্রেরণাও ছিল। মা তাঁর স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীর সময় কিছুদিন গীটার শিখেছিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলেছিলেন অনেক। সে-গীটার পড়েইছিল বাড়ীতে। একটু মেজেঘষে আর ছেঁড়া তার সারিয়ে নিতেই সে আবার চনমনে। ঠিক হলো, সেই গীটার আর মায়ের পুরনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির খাতা নিয়েই শুরু হবে আমার শিক্ষা। কিন্তু কার কাছে ? আমি কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে আর লোকমুখে শুনে কয়েকটা অ্যাকাডেমির নাম জানতাম। সেগুলোর প্রতিটাই বাড়ী থেকে বেশ দূরে। তাছাড়া বাবার মতে, একবার হায়ার সেকেন্ডারীর পড়ার চাপ শুরু হলে বাজনা শেখার শখ বাপ-বাপ বলে পালাবে, তাই প্রথমেই অত ব্যয়সাপেক্ষ অ্যাকাডেমিতে গিয়ে আখেরে কোনো লাভ হবেনা। সুতরাং মায়ের ইচ্ছেয় তাঁর পুরনো গুরুর কাছেই ভর্তি হতে হল। নাম পাঁচুগোপাল মিত্র। আমার প্রবল আপত্তি। লোককে যখন বলব আমি গীটার শিখি আর তারা আমার গুরুর নাম জিজ্ঞেস করবে, আমি বলব পাঁচু মিত্তির ? ছিটেফোঁটাও গ্ল্যামার আছে তাতে ? যাইহোক, প্রথম যেদিন এঁদোগলির ভেতর সেই ঘুপচি ঘরটায় গিয়ে হাজির হলাম মা-র সঙ্গে, দেখলাম এক লম্বা চেহারার প্রৌঢ় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী আর চোখে কালো চশমা পরে বসে আছেন। চোখে প্রায় দেখতেই পান না – এদেশের ভাষায় যাকে বলে 'লিগালি ব্লাইন্ড'। প্রাথমিক আলাপ আর প্রণাম পর্ব মেটার পর উনি ওঁর গীটার হাতে নিলেন। দুচোখ বন্ধ, পিঠ ঋজু, ঘাড় ঈষৎ হেলানো। তার পরের আধঘন্টা আমি নড়াচড়া করতে পারলাম না, আমার মনের সব চিন্তাভাবনা কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল, আমি বাস্তবজগতেই আর রইলাম না। এভাবেও গীটার বাজানো যায় ? শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের শান্ত স্নিগ্ধতা আর নজরুলের সুরের চপলতা নয়, ওঁর হাতের গীটারে কখনো সেতারের অনুরণন, কখনো সরোদের দৃপ্ততা, কখনো বা ব্যাঞ্জো আর উকুলেলের ঝংকার। বেরিয়ে আসার সময় খালি একটা কথাই মনে হচ্ছিল – কিসের বড়াই করে এইচ্ এম্ ভি ? তারা ঘটা করে সুনীল গাঙ্গুলি আর বটুক নন্দীর রেকর্ড বার করতে পারে, আর এঁকে চেনে না ? না, তার পরের দুবছর আর কোনো অ্যাকাডেমির নাম উচ্চারণ করিনি আমি। শুধু আজও মনের এক নিভৃত কোণে রেখে দিয়েছি আমার পাঁচুমামাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা রেজ্ওয়ানা চৌধুরী বন্যার এক রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গিয়ে ওঁর মুখে একটা মজার গল্প শুনলাম। উনি তখন সবে শান্তনিকেতনে শিক্ষাপর্ব শেষ করে বাংলাদেশে ফিরেছেন, একজন উঠতি প্রতিভাময়ী শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। একবার সিলেট মেডিক্যাল কলেজে ডাক পেয়ে সোৎসাহে গেলেন, কারণ সিলেটেই ওঁর শ্বশুরবাড়ী। রথ দেখা আর কলা বেচা - দুটোই হবে। তো সেই কলেজের অডিটোরিয়ামে হলভর্তি শ্রোতার সামনে গাইতে গাইতে শুনলেন পিছনের দিকে বসে থাকা এক ছাত্রের অনুরোধ, 'আপা, হাওয়া-হাওয়া গানটা একটু হয়ে যাক'। বন্যা অনেকদিন স্বদেশের বাইরে, কাজেই সেখানকার মানুষের রুচি আর ভাললাগায় কী পরিবর্তন

ঘটেছে, কোন্ ধরণের 'ট্রেন্ডি' গান বেশী চলছে — উনি খুব একটা জানতেন না। ধরে নিলেন, 'তোমার খোলা হাওয়া' গানটার অনুরোধ করা হচ্ছে। বললেন, 'নিশ্চয়ই গাইব ভাই'। শুনে পাশে বসা তবলচি ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'করছেন কী ? ওটা ইন্ডিয়ার বলিউডের গান হাওয়া হাওয়া, এ হাওয়া। ওসবে একদম কান দেবেন না, নিজের মতো গেয়ে যান'। অনেকটা এইরকমই একটা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেও। একবার ক্লাস টুয়েল্‌ভে পড়ার সময় কলকাতার লালবাজার পুলিশ দপ্তরের কর্মীদের আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে গিয়েছিলাম ঘটনাচক্রে টিকিট পেয়ে যাওয়ায়। সেখানে তখনকার দিনের এক জনপ্রিয় হেমন্তকণ্ঠী শিল্পীকে 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' গানটা করতে শুনে এক অবাঙালী পুলিশকর্মী অতি-উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে দর্শকাসন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওয়াহ্ ওয়াহ্, হিন্দীমে ভি করিয়ে। অউর উও-ওয়ালা ভি — তেরে মেরে মিলন কি ইয়ে র‍্যায়না'। এমন অনুরোধে স্টেজের ওপর শিল্পী কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, আর সারা মাঠে হাসির হুল্লোড়। আসলে তারই কাছাকাছি সময়ে বলিউডের এক কিংবদন্তী বাঙালী সুরকার 'ইয়ারানা' নামক ছবিটিতে সেই বিশ্ববিখ্যাত দীর্ঘকায় মহানায়কের মুখে 'ছুকর মেরে মনকো' গানটির সুর দিতে গিয়ে প্রথম লাইনে 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' থেকে কিঞ্চিৎ ধার করেছিলেন। সেই নিয়ে মিডিয়ায় প্রচুর তোলপাড়ও হয়েছিল। বাংলা না বোঝা ঐ ভদ্রলোকের তাই হয়তো মনে হয়ে থাকবে শিল্পী ঐ হিন্দী ছবির গানটিরই বাংলা ভার্সান গাইছেন। আর 'তেরে মেরে মিলন' গানটায় ঐ কিংবদন্তী বলিউডি সুরকারের বাবা (যিনি নিজেও ছিলেন কিংবদন্তী) সত্যিসত্যিই 'যদি তারে নাই চিনি গো' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির সুর অনেকদূর অবধি অনুসরণ করেছেন। অতএব সেই অনুরোধটিও অযৌক্তিক নয়।

কাহিনীর ঝাঁপি বন্ধ করি এদেশের একটি মজার ঘটনার কথা বলে। আমি টেক্সাসের হিউস্টন শহরে আর ওয়াশিংটন রাজ্যের সীয়্যাট্‌ল্ শহরে থাকার সময় সেখানকার দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য যে সাপ্তাহিক বাংলা পাঠশালাদুটি ছিল, তাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম। শিক্ষক হিসেবে, পরিচালক বোর্ডের সাহায্যকারী হিসেবে। সীয়্যাট্‌লের পাঠশালায় ছাত্রদের মধ্যে ছিল দুই ভাই — বড়টি বছর সাত-আটের আর ছোটটি সম্ভবতঃ পাঁচ। দুজনের চরিত্রের বৈপরীত্য ছিল দেখবার মতো। বড়জন শান্ত, মেধাবী। ছোটজন ডাকাবুকো, বুদ্ধিমান, দাদাকে প্রতিটি ব্যাপারে 'ডাউন' করতে পারলে বা ভুল প্রমাণিত করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। একবার নির্ধারিত দিন অর্থাৎ রবিবারের বদলে শনিবারে হচ্ছে পাঠশালা, শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করেছেন 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' কার লেখা ? সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাত তুলে উত্তর দিয়েছে, 'আমি জানি, আমি জানি, রবিদাদু'। ওর ভাই তখনো পাঠশালায় ভর্তি হয়নি, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছিল সেই ঘরে। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'Mummy, mummy, he is wrong. It should be শনিদাদু — today is Saturday!'। গত প্রায় দেড়শো বছর ধরে যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালী কচিকাঁচার শুধু শনি নয়, সারা সপ্তাহের — সর্বক্ষণের দাদু, তাঁর হাত ধরে আর তাঁর বই পড়ে বাংলা নামক মিষ্টি ভাষাটি শেখার সুযোগ আগামী শতাব্দীগুলিতেও যাতে শিশুরা পায়, সেটা নিশ্চিত করার চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে আমাদের সুদূর প্রবাসে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে রাখার ?

সুজয় দত্ত — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

শিরোধার্য দাড়ি

স্বর্ভানু সান্যাল

এই যে বড়দা, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি, এই একটু উজ্জয়িনীর রাস্তাটা বাতলে দিতে পারেন ?

আমিও সেই দিকেই যাচ্ছি। জুড়ে পড় ইচ্ছে হলে। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তা তুমি বাপু কিসের খোঁজে ? ভোজ খেতে চলেছ নিশ্চয়ই ? পাত পেড়ে খুব করে মন্ডা মিঠাই খেতে চাও ? ওই ধান্দাতেই আজ সবাই ও মুখো।

আজ্ঞে নানা। আমার বাপের জমিদারি আছে। খাওয়া পরার চিন্তা নেই। আমি যাচ্ছি গান শুনতে। শুনলাম মহাকবি কালিদাস নতুন বই লিখেছেন, কুমারসম্ভব নামে। তো সেই বই তিনদিন তিন রাত ধরে কবি নিজে গান গেয়ে শোনাবেন আর ঠিকঠাক রাজ কর্মচারীর হাত ভেজাতে পারলে কবির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারও পাওয়া যাবে। তা ভাবলাম যাই একটা অটোগ্রাফ নিয়ে আসি আর যদি কোনভাবে কবির সাথে একটা সেলফি ম্যানেজ করতে পারি। আপনিও কি উজ্জয়িনী যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ আমিও সে উদ্দেশেই। কিন্তু উদ্দেশ্য একটা নয়। ছোঁড়াটা নতুন লেখাটা কেমন লিখলে সেটা একটু নিজের কানেই শুনে বিচার করব বলে যাচ্ছি। তা তোমার কি করা হয় ?

দাদা, ঐ যে বললাম বাপের জমিদারি। তাই করতে কিছুই হয়না। তাই লিখি। আমি সামান্য লেখক।

বটে ? তুমিও লেখ। আজকাল দেখছি হেঁজি-পেঁজি গেঁড়ি গুগলি সবাই লিখছে। যাক গে যাক। তা এ ছোঁড়ার লেখা পড়েছ ?

পড়েছি। মেঘদূতম আমার ভীষণ প্রিয়। রসোত্তীর্ণ লেখা। যেমন ভাষার বাঁধুনি, তেমনি মন্দাক্রান্তা ছন্দ, তেমনি ভাব। ''কাঙ্খিতকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত . . .''

ওই লেখাটার জন্য আমি ওকে অবিশ্যি দশে সাত দিতে পারি। এরোটিক রোমান্টিসিজম বিষয়টাকে ভালই এক্সপ্লোর করেছে। কিন্তু ছোঁড়াটা বড্ড বেশি লিখেছে। একজন লেখক জীবনে একটা কি বড়জোর দুটো লিখবে। ভাল লিখবে যাতে হাজার বছর টেঁকে সে লেখা। এত গাদা গাদা লেখার দরকার কি ? বিশেষত অনুপ্রেরণাহীণ অর্ডারি লেখা লিখেছ তো ব্যাস। মাথা থেকে বেরুবে খড়বিচুলি। যতই চিবাও কোন রস নেই। যেমন তোমার এই ''মহাকবি কালিদাসের'' লেখা রঘুবংশম। রদ্দিমাল। আসলে দরকার হল অনুপ্রেরণা, ইনস্পিরেশান।

বাহ দারুণ বলেছেন তো বড়দা। আপনিও লেখক নাকি ? এত সুন্দর কথা বলেন ?

আমায় চেনোনি বুঝি ? অবিশ্যি তখনকার দিনে ঘটা করে বই-এর সাথে বই-এর লেখক-এর ছবি ছাপত না। আর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, রীডিং সেশান এসবও ছিল না। তাই, না চেনাই স্বাভাবিক। আমি একটা বিশাল মহাকাব্য লিখেছি। বহু বছর ধরে সেটা বেস্ট সেলার।

উরিব্বাস। অমন একটা লেখার ইনস্পিরাশানটা কি ছিল দাদা ?

আমার ব্যাপারটা খুব নাটকীয়, ড্রামাটিক। আমি টীন-এজ বয়সে বিশাল বড় ''পাড়ার দাদা'' ছিলাম। গ্যাং লিডার। এলাকায় তোলা তুলতাম, চুরি ছিনতাই করতাম। তখন আমার নাম রত্নাকর। সে নামে সবাই থরহরি কম্পমান। তারপর কি করে একটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটা নরম হয়ে গেলো। ওসব বাজে কাজ ছেড়ে দিলাম। নামটাও এফিডেভিট করে

বদলে বাল্মিকী হলাম। গানটান করতাম। একদিন স্নান করতে গেছি। দেখি কি ? একটা ক্রৌঞ্চ মানে সারস আর কি। জলে নেমে একটা সারসীর সাথে একটু ইয়ে ইয়ে করছিল। মানে ফোরপ্লে আরকি, বুঝলে না ? হঠাৎ এক ব্যাটা আকাট মুখ্য ব্যাধ তীর মেরে মদ্দা পাখিটাকে মেরে দিল। বললে বিশ্বাস করবে না, তার মেয়ে বন্ধুটিও বয়ফ্রেন্ড-এর শোকে খুব কান্নাকাটি করতে করতে আত্মহত্যা করল। আমি স্নান করতে নেমে নিজের চোখে সে দৃশ্য দেখলাম। সেই করুণ দৃশ্য দেখে চোখে জল এসে গেল। কিভাবে নিজের অজান্তেই রচনা করে ফেললাম একটা শ্লোক . . . ''মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা . . .'' ঐটাই আমার লেখা রামায়ণের প্রথম শ্লোক। আমি আদি কবি বাল্মিকী। দাঁড়াও তোমার জন্য আমার প্রথম শ্লোকটা বাংলায় তর্জমা করে দিই। তোমার বুঝতে সুবিধে হবে।

''অসতর্ক মিথুনরত প্রেমিকবরের প্রাণটি চুরি করে
অয়ি আর্য, তুমি শান্তি পাবে না অনন্তকাল ধরে''

আহা, সুন্দর, অদ্ভুত। দাদা আপনার দেখা পাব ভাবিনি। এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। বেড়ে লিখেছেন কাব্যখানা। আমি পড়েছি। একদম খাস্তা মুচমুচে। কিন্তু আপনিতো দাদা এ জমানার নন ? দাদা, ওদাদা নখ খুঁটছেন কেন ? বলছি আপনি তো অনেক আগেকার মানুষ ?

অ্যাঁ, কি বলছ ? ও আমি ? হ্যাঁ, সে অনেক কাল আগে। নয় নয় করেও হাজার তিনেক বছর হবে। তবে কিনা আমি যোগ বলে ত্রিকাল, ত্রিলোকের যে কোন জায়গায় যেতে পারি। তুমিও তো দেখছি বাপু এ জমানার নও। হাজার দুয়েক বছর পরের মানুষ। তুমি এলে কি করে এখানে ?

হ্যাঁ, আমি ভানু সিংহ। বিংশ শতাব্দি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ?

এই যে নখের আমার একটা আয়না আছে — নখদর্পণ। আসলে আমি নখ খুঁটছিলাম না। তোমার পরিচয়টা একটু দেখে নিচ্ছিলাম। তুমি এলে কি করে এখানে ? তুমি ও যোগ টোগ করো নাকি।

আমি টাইম ট্র্যাভেল করে এসেছি। এখান থেকে হাজার তিনেক বছর পর মানুষ সেই কৌশলটি আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু তোমায় যেন দেখলাম হাজার দুয়েক বছর পরে এসেছ। নাকি ভুল দেখলাম। অনেক দিন নখটা পরিষ্কার করা হয়না। কি দেখতে কি দেখলাম ?

না না দাদা, আপনি ঠিকই দেখেছেন। আপনার নখ একদম নির্ভুল। আসলে একটু ঘুর পথ নিতে হয়েছে। মহাকবির সাথে দেখা করতে হাজার খানেক বছর ভবিষ্যতে গিয়েও টাইম ট্র্যাভেল টেকনোলজি ব্যবহার করে তবে আসতে পারা।

বেশ বেশ। তুমি তো দেখেছি বেশ বিখ্যাত। অনেক পুরষ্কার টুরষ্কার পেয়েছে। এই পুরষ্কারটা নিয়ে খুব হইচই দেখছি। নোবেল নাকি ?

না দাদা, আপনার কাছে আমি কিসসু না। হাতির কাছে পিঁপড়ে। নোবেল হল আমাদের জমানার সেরা পুরষ্কার। প্রথমে তো আমার লেখা কেউ পড়ত না। পরে যবন ভাষায় অনুবাদ করে ওই পুরষ্কারটা পেয়ে গেলাম। তখন দেশের লোকেরা আমায় মাথায় তুলে নাচানাচি করতে লাগল। বাঙালি বিশ্ব বিধাতার এক আশ্চর্যতম সৃষ্টি। বুঝলেন না। ভাল করেছেন আপনি বাংলায় লেখেননি। নোবেল না পেলে আপনাকেও কেউ পুঁছত না বাঙলায়।

বটে। কিন্তু তুমি বাপু তোমার ওই নোবেলটি একটু সামলে রেখো, মানে তোমার সাগরেদদের সামলে রাখতে বোলো। আমার নখদর্পণ বলছে ওটা কোন ঊর্বর মস্তিষ্ক বাঙালি পরবর্তী কালে ঝেঁপে দেবে। তবে সে ঘটনাটি বোধ হয় তোমার জীবন সীমার বাইরে। যাক গে যাক। তা তোমার লেখা দু-একটা পাঠিও। পড়ব। কটা লেখা বেরিয়েছে এখন অব্দি ?

আজ্ঞে সে বললে আপনি খুব রাগ করবেন। অনেক লিখে ফেলেছি। আসলে কি করব ? কিছুই করার থাকে না যে। জমিদারি টমিদারি আমার দ্বারা হয় না। ও সব দাদারাই সামলায়। সকলের ছোট ভাই। তাই সাতখুব মাপ। তা লিখেছি

বলতে, এই ধরুন একডজন উপন্যাস, বেশকিছু ছোটগল্প, হাজার তিনেক গান, ডজন দুয়েক কাব্যগ্রন্থ, কিছু প্রহসন, গীতিনাট্য, নাট্যকবিতা . . .

থামো, থামো, থামো । মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে ভাই । যাক গে যাক । অন্য কথা বলি । একটা কথা কি জানো, লেখক যদি তারিফ পাওয়ার জন্য লেখে সে লেখার ষোল আনাই ফাঁকি । নিজের খুশিতে নিজের মনের কথাটি লেখার জন্য পেন ধরলে তবেই ওই কি যেন বললে ''রসোত্তীর্ণ লেখা'' বেরোয় । তোমার কি মত এ ব্যাপারে ?

হ্যাঁ দাদা । একদম একমত । আমি তো সম্পূর্ণ নিজের খুশিতে লিখি । সব যে ছাপাই তাও নয় ।

বেশ, বেশ । যাক কথা বলতে বলতে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি । ওই যে সূর্য তোরণ দেখা যায় । ওইটে উজ্জয়িনী । তা নখদর্পণে তোমার যে ছবি দেখলাম তাতে যেন তোমার আমার মতই বড় বড় দাড়ি দেখলাম । তুমিতো দেখছি রীতিমত ক্লীনশেভড । এমনটা কেন দেখলাম, তাই ভাবছি ?

দাড়ি, দাড়ি তো আমি রাখিনা বড়দা । আপনি কি অন্য কারুর ছবি . . . ?

- - - - -

রবি, রবি, ওঠ । আর কত ঘুমুবি ? কটা বাজে জানিস ? আমাদের বজরার ডেকে গিয়ে দেখ, কেমন বৃষ্টি পড়ছে । আজ মেঘ না পেখম তোলা ময়ুরের মতোই সুন্দর ।

''এহে, এতো দেরি হয়ে গেলো ? আসলে কাল একটু রাত করে লিখছিলাম ।'' রবি উঠে কয়েকদিনের না কাটা দাড়িতে হাত বোলায় । পাশে খোলা তার খেরোর খাতা । তারপরের কাব্য গ্রন্থ মানসীর গুটিকত কবিতা তাতে লেখা । কাল আষাঢ় মাসের পয়লা তারিখে মেঘনা বক্ষে ঝুম বৃষ্টি দেখতে দেখতে খুব মনে পড়ছিল তার প্রিয় লেখক মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদুতের সেই বিখ্যাত লাইন ''আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু . . . .''

তাই কবি কালিদাসের সম্মানেই চারলাইন লিখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে ।

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক

পেনটা তুলে নিয়ে পরের চারটে লাইন লিখতে গিয়ে হঠাৎ গতরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে থমকে গেলো রবি ।

''স্বপ্নে মহাকবি বাল্মিকী বললেন যেন আমার বড় বড় দাড়ি দেখেছেন । দাড়িটা রেখেই দেখব নাকি ? অতবড় একজন কবি বলেছেন যখন সে কথা আদেশ বইতো নয় । তায় আবার ভদ্রলোক ত্রিকালদ্রষ্টা । ঠিকই দেখেছেন নিশ্চয়ই । এ আদেশ শিরোধার্য । এখন থেকে দাড়িটা শিরে ধারণ করে দেখি কেমন লাগে আমাকে ।''

Swarvanu Sanyal — Software engineer living in Naperville, Illinois. I regularly write poems, fictional works like short stories, short plays and non-fictional works like essays in different topics.

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্য : কিছু সশ্রদ্ধ মজলিশি রঙ্গ রসিকতা

সিদ্ধার্থ দে

সেদিন 'বাতায়ন' পত্রিকা থেকে রবীন্দ্র সংখ্যায় কিছু লেখার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। অষ্ট্রেলিয়াতে উভয় সংকট জাতীয় পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য চলতি কথা ''Caught between a rock and a very hard thing'' । আমার দশা কতকটা সেইরকম – 'বাতায়ন' এর মত পত্রিকায় লেখার লোভ সমালাতে পারছি না, আবার রবীন্দ্রানুরাগী হলেও গুরুগম্ভীর কিছু লেখার ব্যাপারে অস্বস্তিও যাচ্ছে না। লোক হাসানোর আশঙ্কায়।

কিছুদিন আগে ফেসবুকে এক চটুল লেখায় কয়েকটি গানকে (''তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'', তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা . . . ., ''তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম . . .'') প্রেমের গান হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম। এক রবি অনুরাগিনী আমার অজ্ঞতা ফাঁস করে জানালেন গানগুলি পূজা পর্যায়ের, প্রেমের নয় এবং গুরুদেবকে নিয়ে এরকম সস্তা আলোচনার জন্য কিঞ্চিৎ ভর্তসনাও করলেন। মুশকিল হল, আমার মত আম আদমির সিরিয়াল যা খাওয়াচ্ছে তাই খাচ্ছি। হামেশাই দেখি এই গানগুলি মাখো মাখো প্রেমের দৃশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে – জানব কেমন করে যে এগুলি ঈশ্বর বন্দনার গান ? আগেই সাফাই গেয়ে রাখলাম তাই বিপজ্জনক এলাকা বা dangerous territory তে পা রাখার আগে।

তবে পঞ্চাশের দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হওয়া অধিকাংশ মানুষেরই মনে হয় 'রবি ঠাকুরের' বিষয়ে একেবারে আনপড় থাকা কঠিন। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। যতই ট্যাশ ইস্কুলে পড়ি না কেন – রবীন্দ্রনাথ সঙ্গ ছাড়েন নি। কোনদিনই। নীচু ক্লাসে ''কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি'' তো ছিলই। বাড়িতে ছিল দেওয়ালে টাঙানো ছবি, যাতে প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখে মালা পড়ানো হত, ঘর ভরে থাকত ধূপের মিষ্টি গন্ধে। তখনো নোবেল প্রাইজ ব্যাপারটা মাথায় সেভাবে ঢোকেনি – কিন্তু মানুষটা যে বাঙালির গর্ব এটা বুঝতে পারতাম।

প্রাইমারি স্কুলে আমাদের বাংলার দিদিমনি ছিলেন লতিকা সেন নামে এক মহিলা। খুবই নরম স্বভাবের মানুষ- বকাঝকা মারধোর একেবারেই করতেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক রচনার প্রথম লাইনে এক সহপাঠী যখন লিখে বসল ''রবিনডরনাত একটি কপি ছিলেন'' লতিকা দিদিমনি আর মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। ছেলেটিকে আলতো করে চড় মারছিলেন আর মাথা নেড়ে ছল ছল চোখে বলছিলেন ''ছি ছি ছি, তুমি বাঙালির ছেলে হয়ে রবীন্দ্রনাথ বানান করতে জাননা ? আর কপি মানে জান ? তুমি ওনাকে শেষে কপি বানিয়ে দিলে। কি লজ্জা, কি লজ্জা !''

ঘটনাটা অর্ধশতাব্দ পুরনো – তবুও স্পষ্ট মনে আছে। উল্লেখ করার কারণ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে গড়পড়তা বাঙালির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও স্পর্শকাতরতা বোঝানোর জন্য।

কিছুদিন আগে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রমিতা মল্লিক ফেসবুকে একটি পোষ্টে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে 'রবি ঠাকুর' নামে উল্লেখে তাঁর আপত্তির কথা। তাঁর মতে, এই নামে উল্লেখ কবির প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক – তিনি শুধুই 'রবীন্দ্রনাথ'।

এইসব ভেবেই ওনার সম্বন্ধে কিছু লিখতে অস্বস্তি হচ্ছে। আমি আদতে চটুল স্বভাবের মানুষ, গুরুগম্ভীর কিছু লিখতে গেলেই খেই হারিয়ে ফেলি, হাল্কা বিষয়েই আমি স্বচ্ছন্দ। আশঙ্কা হচ্ছে, কঠোর রবীন্দ্রপ্রেমীদের সম্ভাব্য ঊষ্মার কথা চিন্তা করে। তাই এই লঘু মেজাজের লেখার উপযুক্ততা বিচারের ভার সম্পাদকের উপরেই ছেড়ে দিলাম।

তবে হাল্কা কিছু লেখার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনদর্শনের তথা হাসিঠাট্টার প্রসঙ্গে একটি উদ্বৃতি দিলাম :

''এত বুড়ো কোনদিনও হব নাকো আমি,

হাসি ঠাট্টারে যবে কব ছ্যাবলামি।''

আমার নিজের রবীন্দ্রানুরাগের শুরু গানের মাধ্যমে। সে আমলে গ্রামোফোন রেকর্ড রোজগারের তুলনায় মহার্ঘ ছিল। বিশেষ করে একটু বড় আকারের লং প্লেয়িং রেকর্ডগুলি। অনেক যত্নে রাখা থাকত। ছোটদের হাত দেবার অধিকার ছিল না। এই রেকর্ডগুলির মধ্যে একটি ছিল 'শ্যামা' গীতিনাট্য। একটা বয়সে স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর থাকে। বার বার শোনার ফলে বুঝি আর না বুঝি পুরো গীতিনাট্যটি কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। 'শ্যামা'র উপ, আর by association, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর, প্রচন্ড বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। শ্যামার চক্করে বজ্রসেনকে বাঁচানোর জন্য খামোখা বেচারা infatuated উত্তীয়কে ''ন্যায় অন্যায় জানিনা, শুধু তোমারে জানি ওগো সুন্দরী'' গেয়ে মরতে হল !

তবে শুরুর অনুভূতি যাই হোক না কেন ঐ 'শ্যামা'-র হাত ধরেই রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্তরঙ্গ ভাবে আমার জীবনে মিশে গিয়েছিল। আজও বিশেষ মুহূর্তগুলিতে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলিই মনে পড়ে। আর কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কখন যেন আমার সবচেয়ে প্রিয় গায়িকা হয়ে উঠেছিলেন। ওঁর গায়কী আমার জীবনের আনন্দধারা। অশ্রুভরা বেদনার মুহূর্তগুলির স্নিগ্ধ প্রলেপ।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে : ''imitation is the highest form of admiration''। ইমিটেশনের আক্ষরিক অর্থ নকল করা। রবীন্দ্রনাথ সে দিক দিয়ে অননুকরণীয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কবিতা বা গান নিয়ে ঠাট্টা মশকরা অনেকদিন ধরেই চলছে। আমার মতে এগুলি তাঁকে নতুন করে পাওয়ার সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টা। এই জাতীয় কিছু মশকরা বা ছ্যাবলামিই এই লেখার মুখ্য বিষয়।

ষাটের দশকে আমাদের শৈশব-কৈশোরে প্যারডি গানের বেশ চল ছিল। প্যারডি গায়ক হিসাবে মিন্টু দাশগুপ্তের নামই সর্বাগ্রে মনে পড়ছে। জনপ্রিয় হিন্দী সিনেমার এবং আধুনিক বাংলা গানের সুরে মজার কথা বসিয়ে বেশ কিছু জমাটি গান গেয়েছিলেন ভদ্রলোক। যেমন সঙ্গম ছবির ''ইয়ে মেরা প্রেম পত্র পড়কর, না তুম নারাজ না হো না'' গানটির প্যারোডির প্রেক্ষাপট ছিল এইরকম : এক প্রেমিক জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের কারণে প্রিয়ার কাছে কাতরভাবে ক্ষমাভিক্ষা করে বিবাহে অপারগতার কথা ব্যক্ত করে চিঠি লিখছে :

''প্রিয়া তোমায় চিঠি লিখি,
বুক ভেঙে যায় তবু লিখি . . .,
আমার চিঠি পাবার পর,
আমাকে তুমি মিছে ভুল বুঝো না,
যে কথা দিয়েছিলাম গো,
সে কথা আমি ফিরিয়ে নিলাম গো . . .''

মজাদার গান। তবে কোন কারণে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে মশকরা বিশেষ চলত না। হয়তো সেই আমলে বিশ্বভারতীর দাপটের জন্য। যে দাপট দেবব্রত বিশ্বাসকে ব্রাত্য করে তাঁর সঙ্গীতের ধারা রুদ্ধ করেছিল।

তবে বাড়াবাড়ি না করলে হালে সেসব বাধা আর নেই। 'ভূতের ভবিষ্যৎ' নামে জমজমাট ছবিটিতে 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'' এর অনুকরণে এক পোড়ো বাড়ির ভূতদের সমবেত কণ্ঠে শুনলাম ''আমরা বিটকেল, আমরা কিম্ভূত, আমরা চৌধুরী প্যালেসের ভূত !'' কোন বিতর্ক হয়েছে বলে শুনিনি।

অগ্রজ বন্ধু অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী মশায়কে ঘরোয়া মজলিশে বেশ কয়েকটি আসর মাতানো রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্যারডি বানাতে শুনেছি – তার মধ্যে একটি হল ''fake রবীন্দ্রসঙ্গীত''। এটা যদিও কোন বিশেষ গানের সুরে নয় – তবে কথা এবং সূর এতই রাবীন্দ্রিক যে বিশেষজ্ঞরাও ভাববেন সেটা কোন স্বল্পপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত।

দীপেশদার আর একটি প্যারডির কথা এইরকম :

''আমার যে সব ধুতে হবে
সে তো আমি জানি
যেথায় যত খাওয়া বাসন
এঁটো থালাখানি
সব ধুতে হবে।

আমার হাতের ভ্যাকুম ঝাড়ন
ফুঁপিয়ে মরে সে যে
হপ্তা শেষের ময়লা কাপড়
রান্না ঘরের মেঝে
সব ধুতে হবে।

কার্পেটে দাগ চায়ের কফির
উঠবে না সে স্প্রে-তে
কেউ দেয়ালে চিহ্ন রাখে
কেউ বা টয়লেটে-তে
সব ধুতে হবে।

আমার সকাল আমার সন্ধ্যা
যায় না বৃথা বসে
সৃষ্টি সুখের আনন্দ পাই
সাবান ঘষে ঘষে
সব ধুতে হবে।''

মূল গানটি কি বলা নিস্প্রয়োজন মনে হয়। বিদেশে ছাত্রজীবনে ওনার সপ্তাহান্তের কাতর অবস্থার বর্ণনা এই প্যারডিটির মাধ্যমে।

অন্য এক ধরণের মস্করা দেখেছিলাম ''ননীগোপালের বিয়ে'' নামে সত্তরের দশকের একটি ছবিতে। প্রখ্যাত কৌতুকশিল্পী চিন্ময় রায় কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাখ্যা করছেন :

প্রথমটি ''এ পথে আমি যে, গেছি বার বার, ভুলিনি তো একদিনও . . ।'' চিন্ময় জানালেন এক বহুবার জেল খাটা দাগী চোর পুনরায় ধরা পড়ে জেলের পথে চলতে চলতে গানটি গাইছে। দ্বিতীয়টি ''একদিন চিনে নেবে তারে . .'' । দর্শকরা সমৃদ্ধ হল নবলব্ধ জ্ঞানে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বিশ্বকবি ছিলেন তাই নয়, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও ছিলেন। বহু আগেই তিনি বলে গিয়েছিলেন তিব্বত একদিন চীন দখল করে নেবে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ছুঁয়ে বহু উঁচুমানের লেখা আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, যেমন – **'রানু ও ভানু', 'সেই সময়', 'প্রথম আলো'**। তাঁর লেখায় সুক্ষ্ম রসিকতায় রবি ঠাকুর এসে পড়েছেন থেকে থেকেই। একটি মনে পড়ছে – যদিও উপন্যাসটির

নাম ভুলে গেছি। খুব সম্ভবত নীললোহিত সিরিজের কোন লেখা। সিচুয়েশনটি এইরকম : এক ঝামেলা এড়ানো চরিত্রকে অপর একজন দলে টানার চেষ্টা করছে। কথোপকথন (স্মৃতি থেকে লিখছি) কতকটা এই রকম ছিল :

— এই গানটা শুনেছ

''ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যেবেলায় কে ডেকে লয় তারে ?''

বলতো কে ডেকে নেয় তাকে ?

— উত্তর না পেয়ে বক্তা বিধান দিলেন — মধ্যপন্থীদের কেউ ডেকে নেয় না ! তারা সন্ধ্যেবেলায় একলা ঘরে বসে চুক চুক করে হুইস্কি খায়। মেসেজটি হল : কোন একটি দলে ভিড়তেই হবে বাঁচার স্বার্থে ! দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না।

একটা জনপ্রিয় সিরিয়ালের কথা মনে পড়ছে। ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত 'গানের ওপারে'। যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সার্ধ-শতবর্ষ (কিছু বানান-অপটু ভক্তের কলমে যা 'শ্রাদ্ধ-শতবর্ষ হয়ে গিয়েছিল!) উপলক্ষ্যে রূপায়িত হয়েছিল। সিরিয়ালের ঘটনাবলী এক রক্ষণশীল রবীন্দ্রানুরাগী পরিবারকে নিয়ে। পরিবারের মাথা দাদু চন্দ্রশেখর দেব রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে এক অথরিটি। দেব বাড়ির নাম 'সোনার তরী'। এহেন চন্দ্রশেখরের নাতনি প্রেমে পড়ল এক পাঞ্জাবী যুবকের। দাদুকে ইমপ্রেস করার জন্য যুবকটিকে ''কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি'' কবিতাটি মুখস্থ করিয়ে একদিন বাড়িতে নিয়ে এলো আদরের নাতনিটি। একথা ওকথার পর শুরু হল আবৃত্তি। বেশ গড়গড়িয়ে চলছিল গোরুর গাড়ি, কিন্তু মাঝপথে ছেলেটি একটা সেমসাইড গোল করে বসল — ''গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন'' বলতে গিয়ে আবৃত্তি করল ''গাড়ি চালায় বানসিবাদান, সঙ্গে যে যায় ভাঙা মাদান।'' অবস্থা সামাল দেবার জন্য দাদু বললেন ''দেখলে, ভিন্নভাষী একজন মানুষ কি সুন্দরভাবে রবীন্দ্রনাথকে আপন করে নিল'' প্রায় পঞ্চাশটি গানে সমৃদ্ধ সিরিয়ালটি রবীন্দ্রসাহিত্য এবং সঙ্গীত নিয়ে এই ধরণের নানা ধরণের মজার ঘটনায় সমৃদ্ধ ছিল। সাহিত্য সিনেমা সিরিয়াল সঙ্গীত ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রঙ্গরসিকতায় কথাবার্তায় রবি ঠাকুর হামেশাই ঢুকে পড়েন কিছুটা অবচেতনেই। সেদিন যেমন কোন এক উপন্যাসে পড়ছিলাম এক নববিবাহিত খুনসুটির কথা। কনে ঘটি, রবীন্দ্রানুরাগিনী। বর কাঠ বাঙাল, ততোধিক কেঠো ইঞ্জিনিয়ার। বৌকে রাগানোর জন্য ছেলেটি বলল : ''তোমার গুর্দেবের সেই কবিতাটা পড়েছ, ভালবাসা মোরে বাঙাল করেছে।'' এইভাবে বাঙলার ঘরে ঘরে, প্রতিদিন সামাজিক মাধ্যমের গুলতানিতে আমরা রবি 'ঠাকুর' কে নানা রকম মশকরার মাধ্যমে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করছি। যাকে বলে গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো আর কি !

সিদ্ধার্থ দে — আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যানপ্শায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপারি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ — ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে।

আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ

সিরাজুস সালেকিন

স্রষ্টা সৃষ্টি করেন তাঁর আপন খেয়ালে। তার পিছনে না থাকে তাঁর পূর্বে পরিকল্পিত কোন লক্ষ্য, না থাকে বাহিরের জগতে তা প্রচার করার কোন উদ্দেশ্য। তিনি শুধু সৃষ্টি করে চলেন। কারণ সৃষ্টি করাই তাঁর স্বভাব, তাঁর অন্তরের ধর্ম। অকপৃণ তাঁর দাক্ষিণ্য।

সময় সময় সেই সৃষ্টির ধারা এত বিপুল এত অপ্রতিহত হয়ে ওঠে যে, তা একটা সম্পূর্ণ নতুন যুগের অবতারণা করে। একটা নতুন প্রাণোচ্ছাসে ভরিয়ে তোলে মানুষের জীবনকে। এই স্রষ্টাদের যখন আবির্ভাব হয় শিল্পে, সংগীতে কি সাহিত্যে তখন তাদের ভিতর দিয়ে জাতির চিত্তের ধারা নতুন প্রাণাবেগে স্পন্দিত হয়ে ধেয়ে চলে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে দ্বারকানাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত — এই তিন পুরুষের যে সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হয়েছিল তা এখন বাঙালীর দৈনিক দিনযাপনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমাদের বাঙালির জীবনের এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন আমরা কবিগুরুর গানকে অবলম্বন করি না।

কবিগুরুর জীবনধারা আমাদের জাতীয় জীবনের বহুমখী সৃষ্টিধারার সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে তাঁর কর্ম কীর্তিকে বিস্মৃত হলে জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ধারা বিস্মৃত হবার নামান্তর হয়ে পড়ে। আজ থেকে ৬৪ বছর আগে ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু অনন্তলোকে যাত্রা করেন। কবিগুরু নিজেই বলেছেন 'কম গান লিখেছি !! হাজার হাজার গান !! বাংলাদেশকে গানে ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাকে ভুলতে পারো — আমার গান ভুলবে কি করে ?'

আমি বাংলাদেশের মানুষ। বাংলা নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব। এই বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছে। বাংলা ভাষার প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, পাবনার শাহজাদপুর, নাটোরের পতিসর, ইত্যাদি স্থানে থেকেছেন অনেকদিন। আমি বাংলাদেশে তাঁর অবস্থানের সময়ের কিছু ঘটনার কথা আপনাদেরকে সবিনয়ে বলতে চাই।

১৮৭৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলাইদহ আসেন বড় ভাই জ্যাতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। তখন তার বয়স ১৫। সেই প্রথম শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রেমে পড়লেন বালক রবীন্দ্রনাথ। প্রমত্ত পদ্মা তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করলো।

১৮৯১ সালে ৩০ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহে আসেন। টানা ১০ বছর স্থায়ীভাবে ছিলেন শিলাইদহে। তবে মাঝে মাঝে পাবনার শাহজাদপুর, নাটোরের পতিসর এসব জায়গায় যেতে হতো তাঁকে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হলে — তিনি শিলাইদহ ছেড়ে বোলপুর চলে যান।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ী

শিলাইদহে তিনি রচনা করেন সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, কথা, কল্পনা, নৈবেদ্য, চিত্রাঙ্গদা, মালিনী, গান্ধারীর আবেদন, বিদায় অভিশাপ, কর্ণকুন্তী সংবাদ, এবং অর্ধ-শতাধিক ছোট গল্প এবং ছিন্ন-পত্রাবলীর পত্রগুচ্ছ।

১৮৮৪ সালে তিনি মাত্র দুটি গল্প লেখেন। তারপর আর কোন গল্প লেখেননি অনেক বছর। ১৮৯১ তে শিলাইদহে আসার পর রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখেন অসংখ্য। এর সাথে সাথে

শাহাজাদপুরে কবিগুরুর কাছারি বাড়ী

কবিতা, গান, নৃত্য-নাট্য রচনা করেন প্রচুর। শিলাইদহের পদ্মা নদী আর এর অবারিত প্রাকৃতিক দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশে এক বিরাট স্থান নিয়েছিল — এতে কোন সন্দেহ নেই।

এসময় তাঁর কাছে শিলাইদহে নিয়মিত বেড়াতে আসতেন দ্বিজেন্দলাল রায়, দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, তাঁর বোন নিবেদিতা, নন্দলাল বসু, নাটোরের মহারাজা, লোকেন পালিত এবং আরও অনেক নামকরা সব মানুষরা।

শিলাইদহে থাকাকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন অমলা দাশ প্রায়ই আসতেন। তিনি ছিলেন মৃণালিনী দেবীর অত্যন্ত ঘনিষ্ট বান্ধবী। অত্যন্ত সগ্যুয়িকা। এই দুবান্ধবীর বিভোর আলাপ দেখেই কবিগুরু লিখেছিলেন 'ওলো সই ওলো সই — আমার ইচ্ছে করে তোদের মতন মনের কথা কই'।

পদ্মার বোটে চড়ে কবি বেরোতেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে — এ বোটেই রচিত হয়েছে বিখ্যাত সব গান, কবিতা, গল্প, নাটক, নৃত্যনাট্য আর অন্য সব রচনা। এ সময় স্নান আহার ছেড়েও তিনি লিখে যেতেন একটানা কয়েকদিন ধরে। পদ্মা বোটের পাচক ছিলেন কবিগুরুর প্রিয় বাবুর্চি গফুর মিয়া।

জমিদারী তদারকির জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে ৩০০ টাকা মাসোহারা পেতেন। এ দিয়েই তিনি চালিয়ে নিতেন তাঁর সংসার। এসময় তাকে কুষ্টিয়ার শাহজাদপুর, পতিসর এসব জায়গায় গিয়েও জমিদারী তদারক করতে হতো।

শাহজাদপুর প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছেন 'এখানে আমার যেমন লেখবার ভাব আসে — আর কোথাও তেমন হয় না'। শাহজাদপুর সম্পর্কে কবির ভালবাসা বোঝা যায় এই চিঠিটিতে।

'মানুষের এক জীবনে জন্ম-জন্মান্তর ঘটে। শাহজাদপুরের সীমানার মধ্যে যে দিনগুলি গাঁথা পড়েছিল — তার রূপ, রস, তার হাওয়া, তার আলো আর-এক-জন্মের। এখনকার থেকে কেবল আমিই যে স্বতন্ত্র ছিলাম — তাই-ই নয় — তখনকার মানুষ ছিল অন্য জগতের। সেই আমার দূরবর্তী জন্মের শাহজাদপুর আমার মনকে টানে — কিন্তু সে কি এখনও কোথাও আছে ? সে যে ছিল আমার মনকে জড়িয়ে নিয়ে, সে মন কোথায় হারিয়ে গেছে। না হারালে চলতো না — কারণ এখন জন্মান্তরের পালা।'

১৯০১ সালে শিলাইদহ ছেড়ে গেলেও মাঝে মাঝেই এখানে আসতেন। ১৯২২ সালে কবি শেষবারের মত শিলাইদহে আসেন। এসময় তিনি চারদিন থাকেন এবং প্রতিদিন একটি করে গান রচনা করেন। গানগুলি হচ্ছে ''আসা যাওয়ার পথের ধারে'', ''নিদ্রাহারা রাতের এ গান'', ''কার যেন এই মনের বেদন'' এবং ''এক ফাল্গুনের গান সে আমার''। এ গানগুলিতে কবিগুরুর শিলাইদহের স্মৃতি ও শিলাইদহে না থাকার বেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

কুঠিবাড়ীতে ভোজনরত কবিগুরু

১৯১২ সালের এপ্রিলে কবিগুরুর বিলেত যাওয়ার কথা। যাত্রার একদিন আগে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। ডাক্তরের আদেশে বিশ্রাম নিতে চলে আসলেন শিলাইদহে। এসময়ই তিনি গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করতে লাগলেন। পরের বছর এই অনুবাদই তাঁকে নোবেল প্রাইজ-এ ভূষিত করে।

কবিগুরু তাঁর জন্মদিনের গান রচনা করে গেছেন এবং সেই সাথে মৃত্যুদিবসের গানও রচনা করে গেছেন। তাঁর জন্মদিবসের গান — ''হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ''। এটি রচনা করেন তাঁর মৃত্যুর আগের জন্মদিন উপলক্ষে (২৩শে বৈশাখ ১৩৪৮, ইং ৬মে, ১৯৪১)। ৭ই অগাষ্ট, ১৯৪২ রবীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

আর মৃত্যুদিবসের গান — ''সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'' — এটি রচনা করেন ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ — মৃত্যুর তিন বছর আগে। কবিগুরু অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এ গানটি যেন তাঁর মৃত্যুর আগে গীত না হয়। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাবাসরে গানটি প্রথম সাধারণ সমক্ষে গীত হয়।

কবিগুরুর শেষ লেখা ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই সকাল সাড়ে ন'টায়।

''তোমার সৃষ্টির পথ রেখে আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুন হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।''

এর এক সপ্তাহ পরেই কবিগুরু দেহত্যাগ করেন।

আমি আমার বাবাকে হারালাম মাত্র সেদিন — ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫। বাবা গানের মানুষ ছিলেন। গান লিখতেন, সুর করতেন — গাইতেন। এই গানের সুবাদেই আমার সাথে বাবার ছিল এক অন্যরকম সম্পর্ক। ছোটবেলায় বাবার দরাজ কণ্ঠেই প্রথম শুনি কবিগুরুর গান — এ মনিহার আমায় নাহি সাজে, ওই আসনতলের মাটির পরে, আরো অনেক গান। ক'বছর পরে মা-ও চলে গেলেন। কাজেই বাবা আর মা-কে হারিয়ে আমি গভীর এক শোকের মাঝে পড়লাম। অলস প্রহরে এখনও আমি বাবা-মা-কেই দেখি, ভাবি, কথা বলি, কাঁদি আর গান গাই। এ কান্না আমার ভিতরে সবসময়ই চলছে। এ যেন কবিগুরুর ভাষায় — ''আমার লুকায় বেদনা — অঝরা অশ্রুনীরে।''

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি সত্যি ঘটনা বলে আমি আমার লেখা শেষ করছি। পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক মুক্তিযোদ্ধা মারাত্মক আহত হয়। পরিখা থেকে বেরিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে যাবার মত অবস্থাও নেই। মৃত্যু যন্ত্রনায় ছেলেটি যখন কাতর হয়ে পড়ে — তখন ছেলেটি বলতে থাকে — ''আমাকে আমার সোনার বাংলা গানটা গেয়ে শোনাও।'' সহযোদ্ধারা তখন তাকে আমার সোনার বাংলা গানটি গেয়ে শোনাতে থাকে। ছেলেটির মুখে সামান্য হাসি দেখা গেল। গানটি শুনতে শুনতেই মুক্তিযোদ্ধাটি শহীদ হোলো। আমার সোনার বাংলা গানটি আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত।

কবিগুরুর গান কি মানুষের মৃত্যুযন্ত্রনা ভোলায় ?

স্বয়ং কবিগুরুর মৃত্যুর সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা কবির মাথার কাছে বসে কবিরই রচিত পূজা পর্যায়ের গান করেছিলেন। এ গান কি তাঁর মৃত্যুযন্ত্রনা কমিয়েছিল ?

সিরাজুস সালেকিন — বাংলাদেশের ঢাকা-তে জন্ম, অধুনা অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির বাসিন্দা। আনন্দধারা'র কুড়ি বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীজাত সম্পাদিত ও বাতায়ন দ্বারা প্রকাশিত দখিনা পত্রিকা থেকে নেওয়া এই প্রবন্ধটি।

শিশু, কিশোর, ... রবীন্দ্রনাথের লেখায়

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা' . . . . কবিগুরুর মতে শিশুরা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন, অথচ সবচেয়ে নূতন প্রাণী। পুরাতন কেননা, যুগযুগান্ত ধরে শিশুরা পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, একই রকম খেলা, দুষ্টুমি, জেদাজেদি, কান্নাকাটি করছে, মা-বাবা সকলকে আনন্দ দিচ্ছে। নূতন, কারণ সব শিশুই তার পরিবার, তার মা-বাবার কাছে নূতন আনন্দ, নূতন সুখের খবর নিয়ে আসে। পৃথিবী নূতন করে শিশুকে ভালবাসে। 'খোকা মাকে শুধায় ডেকে / এলেম আমি কোথা থেকে/ কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?' . . . . মা বলছে 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি বুকের মাঝারে', তার সঙ্গেই আবার বলছে, ... 'সব দেবতার আনন্দের ধন / নিত্যকালের তুই পুরাতন / তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সি' তারপরেই যোগ করে, . . . 'তুই জগতের স্বপ্ন হতে / এসেছিস আনন্দ স্রোতে / নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি' . . . . এই হলো শিশুর সত্য পরিচয়। সব মায়ের কাছে তার শিশুই শ্রেষ্ঠ, তার শিশু নূতন। কবিগুরু নিজের কবিসুলভ অনুভূতিশীল মন দিয়ে সেটা ঠিক বুঝেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিশু সততই প্রিয়। নিজে তিনি সন্তান হারিয়ে, সন্তানের মূল্য বুঝেছেন মর্মে মর্মে, মর্মন্তুদ আশঙ্কায় গেয়ে ওঠেন, ... 'হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে যে চাই / কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে / জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে, বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে / আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে' . . . এই যে আঁকড়ে রাখার, ধরে রাখার বাসনা তাঁর কবিতায় এলো, আমরা এক মুহূর্তে কবির মানবিক রূপটি চিনে নিলাম। যত বড় কবি-ই হন, তিনিও শিশুদের ভালবাসেন, তাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে চান। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জেনে যাই, শিশু আসলে আনন্দের খনি। জগতে আলো ফোটে শিশুর হাসিতে, নিঃশ্বাসে অমৃত বয়ে আনে বাতাস শিশুর চুমোয়, তিনি লেখেন, ... 'যখন চুমিয়ে বদনখানি / হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনি জানি / আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে / বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি --/ বুঝি তা চুমিয়ে তোর বদনখানি' . . . . এই আমাদের কবি, কবি-পিতা-মানুষ সকলের মূর্তরূপ, মিলেমিশে একাকার।

তাঁর ছোটবেলায় যখন তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ির রেলিং গুলোকে ছাত্র ভেবে শিক্ষা দিতেন, শাস্তি দিতেন তখনই বুঝি শিশুর মনোভাব তিনি সম্পূর্ণ বুঝে গেছিলেন। শিশুদের স্কুল সম্বন্ধে, স্কুলের পড়া, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে ভয়, তাঁকেও কষ্ট দিত। বাংলা ভাষা সহজভাবে শিশুদের শেখানোর জন্য তিনি লিখলেন 'সহজ পাঠ', অতি সহজ করে মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা। অনুভূতি অতি তীব্র ছিল, আর তার সুন্দর প্রকাশ করতে পারতেন, তাই তিনি সাধারণ মানুষ নন, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাই তিনি সকলের কবি, বিশ্বকবি। শিশু যখন একটু বড়, তখন মা তার প্রিয়তম রমণী, যেকোনো মুল্যে মা-কে বাঁচানোটা তার অবশ্য কর্তব্য ভাবে। কবি সেটা জানেন, বোঝেন, তাই লেখা হয় 'বীরপুরুষের'-এর মত কবিতা, দস্যুদের হাত থেকে মা-কে বাঁচানোই যেখানে বীরের একমাত্র কর্তব্য। তিনি সকলসময় ছোটদের মঙ্গল চাইতেন, আশীর্বাদ করতেন, তাই দেখি বেজে ওঠে আশীর্বাদ বাণী তাঁর লেখায়, ... 'তুমিও থাক নাই থাক, মনে কর মনে করনা / পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া আমার আশিস ঝরণা'।

শিশু, কিশোরদের সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির মনোভাব তাঁর গদ্য লেখাতেও পাই। তিনি যখন পোস্ট মাস্টার গল্পের রতন কে আঁকেন, সে তো একটি কিশোরীর কাহিনী। চিরদিনের স্নেহ বঞ্চিত কিশোরী রতন যখন যুবক পোস্টমাস্টার-এর কাছ থেকে একটু স্নেহ, সহানুভূতি পেল, সে মনে মনে তার আত্মীয় হয়ে গেল। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে, সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে যুবককে বাঁচিয়ে তোলাই যেন তার পরমার্থ হয়ে দাঁড়ালো। অথচ সেই যুবক যখন বদলি হয়ে আবার শহরে ফিরে গেল, তখন আনন্দের আতিশয্যে সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা সে ভুলেই গেল। এই অবহেলা রতনের বুকে বিরাট

দুঃখের আঘাত হানলো। সেটা বুঝলেন কে ? আমাদের কবিগুরু। তার নরম মনে মানুষের কোনো দুঃখ নজর এড়ায় না। 'ডাকঘর' নাটকে তিনি লেখেন বালক অমলের কথা। অসুস্থ বালকের বন্দী জীবন ভালো লাগেনা, সে উন্মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে চায়, কিন্তু কবিরাজের নিষ্ঠুর, ভুল চিকিৎসা আর স্নেহময় আত্মীয়ের অহেতুক ভয়, তাকে বন্দী থাকতে বাধ্য করে। অবশেষে মৃত্যুর রূপ ধরে আসে কাঙ্খিত মৃত্যু। কবিগুরু নিজের মন দিয়ে বুঝেছিলেন শিশুটির মুক্তিবাসনা, নাটকটির ছত্রে ছত্রে তাঁর সহানুভূতি ছড়িয়ে আছে, যা ছড়িয়ে যায় আমাদের-ও মনে। এখানেই তাঁর লেখার সার্থকতা। একজনের ব্যক্তিগত দুঃখ অনায়াসে হয়ে ওঠে সার্বজনিক। কিশোর, কিশোরীদের নানারকম চরিত্র এঁকে তিনি বুঝিয়ে দেন তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, এবং অনুভূতির তীব্রতা কত বেশি। আমরা পাই মৃন্ময়ী-র মত চঞ্চল বালিকা, পাই তারাপদর মত জগৎ, জীবন, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন, বন্ধন ভয়ে ভীত বালক, মিলিয়ে দেখি আমাদের চারপাশে তেমন কিশোর-কিশোরীর অভাব নেই, কিন্তু আমাদের তো তাঁর মত দেখার চোখ নেই, নেই তাঁর মত লেখার ক্ষমতা। 'ছুটি' গল্পে-র ফটিকের মধ্যে আবার যেন দেখি অমলের ছায়া। গ্রাম্য চঞ্চল, মাঠে-ঘাটে খেলে বেড়ানো বালক, হঠাৎ ইঁট-কাঠ-পাথরের শহরে, মায়াহীন নারীর পরিচয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, ছুটি চায়। সেই তার মাতৃসম গাঁয়ে, নিজের মা-র কাছে ছুটে যেতে চায়। মামা বলেন, স্কুলের ছুটি হলে সে গ্রামে যেতে পারবে। শুরু হয় তার প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। সে যেন অন্তহীন প্রতীক্ষা, তার যেন শেষ নেই। অবশেষে একদিন ক্লান্ত ফটিক পৃথিবীর সব আকর্ষণ থেকে, একেবারেই মুক্তি পায়। মৃত্যুই তাকে এনে দেয় নিষ্ঠুর মানুষের বানানো প্রয়োজনের কারাগার থেকে মুক্তি। স্টিমারের মাঝির জল মাপার সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের কষ্টের জল মাপতে মাপতে, মিলে যায় তার ছুটি। গল্পের শেষে আমরা নিমেষে উপলব্ধি করি রবীন্দ্রনাথের শিশুদের প্রতি দরদী মন। তিনি সাধারণ মানুষের গন্ডি ভেঙ্গে হয়ে ওঠেন এক অনুভূতি সম্পন্ন, মানবদরদী লেখক, কবি। এক মহান মানুষ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে নত হয়ে আসে আমাদের মাথা, এখানেই তাঁর সার্থকতা, তাঁর বিশ্বমানবিকতা।

সেই যখন ছোট্ট ছিলাম একটু খানি মেয়ে
'সহজ পাঠ'-এর সহজ ছন্দে মন উঠলো গেয়ে।

কিশোর বেলায় দুরন্ত মন চাঁদ ধরতে চায়
'সোনার হরিণ চাই' বলে সারাটি দিন গায়।

যৌবনেতে প্রেম এসেছে, বিরহ তার সাথে
'জাগরণে যায় বিভাবরী' গেয়েছি দিন-রাতে।

এর-ই মধ্যে 'প্রকৃতি' কেও ভালো বেসেছিলাম
তোমার গানেই সাজিয়ে ডালা বরণ করে নিলাম।

জীবন এখন ঢলার পথে, চলছে শেষের টান
'পূজা'র থালায় অর্ঘ্য রাখি, নিয়ে তোমার গান।

আমার সারা জীবন জুড়ে তোমার ছবি আঁকা
জন্মদিনে তোমার তরে প্রণাম খানি রাখা।

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

বিশ্বকবি

শাশ্বতী বসু

এনোগ্রাতে ছেলের সঙ্গে দেখা করে রিসর্টে ফেরার জন্য গাড়ীতে উঠতে উঠতে ন'টা বেজে গেল কৃষ্ণকলিদের। কৃষ্ণকলিদের বলতে এখন কৃষ্ণকলি আর শোভনকেই বোঝায়। ওদের ছেলেমেয়েরা এখন প্রাপ্তবয়স্ক। চাকরী করছে। শোভন এসেছে কুইন্সল্যান্ডে জরুরী মিটিং এ্যাটেন্ড করতে। থাকবে ২ দিন Misty Mountain Resort এ। এই দেড় ঘন্টার ফ্লাইট থেকে নেমেই ছেলের সঙ্গে এনোগ্রাতে দেখা করতে গেছিল। গল্প ও ডিনার করতে ৯টা বেজেই গেল।

এনোগ্রা থেকে যখন ওরা Stanford Highway তে পড়ল, কৃষ্ণকলি বললো :

: বাচাঁ গেল। এবার নিশ্চিন্দি। এতক্ষণ যেন কাঁটা হোয়ে ছিলাম। সঙ্গে GPS ও নেই। কোথা থেকে না কোথায় চলে যাই।

: গেলে যাবো – সঙ্গে Petrol আছে। আমাদেরও পেট ভর্ত্তি, মোবাইলে ও Network আছে তবে চিন্তা কিসের ?

: না চিন্তা নয়। তবে বাবা হারিয়ে যেতে যেন কেমন কেমন লাগে।

: তুমি একটা ভীতুর ডিম।

তরল ঠাট্টায় শোভন বলে।

তবে তার মনেও একটা কাঁটা। খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে বেশ খানিকক্ষণ পরে। এতোটা সময় তো লাগার কথা নয়। প্রায় একঘন্টা হয়ে গেল ওরা এনোগরা ছেড়েছে। চলছে তো চলছেই। রাত প্রায় ১০ টার কাছাকাছি। শুক্লা দশমীর চাঁদ হালকা হলুদ আলো ছড়িয়ে আকাশে দেখা দিয়েছে। ম্রিয়মান তারাদের আশেপাশে নম্রমধুর উপস্থিতি। হাইওয়ের দুইধারে নানারকম ইউক্যালিপটাস আর গামট্রির ঘনবদ্ধ সারি। জ্যোৎস্নার কুঁচি ঝড়ে পড়ছে তাদের ডালপালা আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

''আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে''

কৃষ্ণকলির মিষ্টিমধুর রবীন্দ্রসঙ্গীতে চমক ভাঙ্গে শোভনের।

সত্যিই অপূর্ব দৃশ্য। আর কৃষ্ণকলি সঠিক গানটাই ধরেছে এইসময়।

কক্কর কঁ কক্কর কঁ হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠলো শোভনের।

: হ্যাঁ বলুন। আমরা এখনও হাইওয়েতে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্যানফোর্ড হাইওয়ে। বুঝতে পারছি না আমরা এখন কোথায়।

Misty Mountain Resort এর Care taker ফোন করেছে। গান থামায় কৃষ্ণকলি। শোভন মন দিয়ে রাস্তার ডাইরেকসান নিচ্ছে।

গাড়ীর হেডলাইট এখন একটি সাইন পোষ্টের ওপর। Misty Mountain Resort এর দিকে এ্যারো চিহ্ন দেওয়া।

: ওই তো আমাদের Resort এর সাইন। কৃষ্ণকলি বলে ওঠে। ফোন কানে চেপেই শোভন এক ঝলক সাইন পোষ্টটি দেখে নিয়ে বলে, হ্যাঁ নাও উই রিচড। মেনি থ্যাঙ্কস। বাই।

: বাঁদিকের কাঁচা রাস্তায় গাড়ী ঘোরায় শোভন। হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ে রাস্তাটি সোজা অনেকদূর চলে গেছে। তার বাঁদিকে সবুজ মখমলের মত মাঠ ঢালু হয়ে একটা জলের ধারে শেষ হয়েছে। বাঁদিকে পাম গাছের সারি। শেষপ্রান্তে তার একসারি কটেজ ছোটো ছোটো — মাথায় তাদের লাল টালির ছাদ।

গাড়ীর কাঁচ নামাতেই একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ নাকে আসে কৃষ্ণকলির। আরো এগোতেই চোখে পড়ে লতানো জুঁইফুলের চাঁদোয়া দিয়ে প্রবেশ পথটি ঢাকা। প্রত্যেক কটেজের সামনের থামগুলো যেন জুঁইফুলের গোড়েমালায় সেজে আছে। নীচে তাদের বেগুনী ডেইজীর ঝালর। জুঁইয়ের মৃদুসুবাসে সারা জায়গাটি যেন স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণকলিকে আবার গান পায়।

সে গেয়ে ওঠে অস্ফুটে,

''মধুর তোমার শেষ যে না পাই
প্রহর হল শেষ
আকাশ জুড়ে রইল লেগে
আনন্দ আবেশ . . .''

শোভন মুগ্ধ চোখে তাকায় এখন কৃষ্ণকলির দিকে। — কটেজের দিশা পেয়ে সে এখন অনেক স্বস্তিতে ।

: তুমি এগোও। আমি কেয়ার টেকারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসি।

কৃষ্ণকলি এগোয় সামনের দিকে। কণ্ঠে তার তখনও রবীন্দ্রসংগীত।

তারপর ক'দিন স্বপ্নের মত কেটে যায় কৃষ্ণকলির Misty Mountain Resort এ। ভোরের আবছা আলোয় হালকা কুয়াশা ঘেরা ঘনবদ্ধ পাইন আর বার্চের দিগন্ত প্রসারী বনের ছবি তুলে, ঝিলের ধারে পানকৌড়িদের টুপটুপ্ ডুব দেখে। পান্না সবুজ ঘাসে ঘেরা পাহাড়ের ঢালে শুয়ে সে গান গায়। ''মেঘের ছায়া আকাশে আজ ভাসে'' — গান গায় ঘাসের বিনুনী দিয়ে তৈরী হ্যামকে শুয়ে। শোভন শোনে আবার ঠাট্টাও করে। বলে,

: ভাগ্য বটে বুড়োর। তামাম তরুণীদের গলায় যেন এখনও লকেট হয়ে ঝুলে আছে।

কৃষ্ণকলি হাসে শুধু নিরুত্তরে।

এমন সুন্দর হলিডে ও একসময় শেষ হয়। শুরু হয় নিত্যকারের রুটিন জীবন। স্টাফরুমে মর্নিংটিতে দেখা হয় বন্ধুদের সাথে।

: কেমন কাটালি কৃষ্ণকলি Misty Mountain- এ ? খুব মিষ্টি তো ?

: মিষ্টি বলে মিষ্টি ! অপূর্ব। কল্‌কল্ করে কৃষ্ণকলি।

: গান গেয়েছিস ? ঠোঁটকাটা সমর জিজ্ঞেস করে হেড মাস্টারী ভঙ্গীতে।

: হুঁ। গেয়েছি। একটু অবাক কৃষ্ণকলি, সমরের প্রশ্নটা কি বুঝতে না পেরে। স্পষ্টবক্তা নির্ভীক ও আবেগ বিবর্জিত সমরকে মানে সমরের শানিত বাক্যবাণকে ভয় খায় না এমন লোক এ অফিসে নেই। বোধহয় সারা পৃথিবীতেও নেই ভাবে কৃষ্ণকলি।

: রবীন্দ্রসংগীত চটকে একেবারে লেবু করে দিয়েছিস তো ? সমর বিচ্ছিরিভাবে বলে।

: মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ সমর — কৃষ্ণকলি চটেমটে ওঠে। তোর কিরে আমি যদি রবীন্দ্রসংগীত গাই। তোর এত মাথাব্যথা কিসের ?

: আমার মাথাব্যথা হবে কেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে মাথাব্যথা তোর — তোদের। কবে কোনকালে তিনি কি লিখেছিলেন এখন ও সেইসব কপচাচ্ছিস। ক্ল্যাসিক ক্ল্যাসিক বলে — বিশ্বকবি বলে। এখনও যেন জ্যোৎস্না রাতে দোলায় বসে ঝুলছেন তিনি সবসময়। আরে মাটিতে তো পা রাখতে হয়।

: আমার মতে জ্যোৎস্না রাতে দোলায় বসে ঝুললেও উনি ক্ল্যাসিক কবি। ছিলেন এবং আছেন এখনও। আমাদের সবার ফিলিংস ওনার মতো কেউ এক্সপ্রেস করতে পারবে না — চিৎকার করে কৃষ্ণকলি।

: এই ''আমাদের''টা কে রে কৃষ্ণকলি ? বাঙালী বুঝি ? তোর মতে বাংলাটাই বিশ্ব ? ফিচেল হেসে বলে সমর। হ্যাঁ তাও যদি বাংলার বাইরে কেউ ওকে চিনতো তেমন করে। অভারতীয় তো বাদই দিলাম।

: তবে শোন্ এই ''আমাদের'' হচ্ছে, আমি, তুই এবং সব্বাই সব্বাই — সব মানুষ। এই আমরা সবাই যেমন করে ভাবি — উনি তেমন করেই লিখেছেন ভেবেছেন। চায়নাতে, রাশিয়াতে জাপানে ওর কবিতা বিভিন্ন কোর্সের মানে সাহিত্যের কোর্সে — ঢোকানো হয়েছে — উত্তেজিত কৃষ্ণকলি বলে।

: হ্যাঁ ওই অবধি। সাধারণ লোক যারা লিটরেচার এর ছাত্র নয় তারা জানে তোদের বিশ্বকবিকে ? গীতাঞ্জলী পড়েছিস ইংরাজীতে। দাঁত ফোঁটানো যায় না। তবে ? সাধারাণের জন্য কি করা হয়েছে বল ? তাছাড়া তোরা ? এই তোরা লিটরেচারের লোকজন কতটা চেষ্টা করেছিস তোদের বিশ্বকবির লেখাগুলো অন্যভাষার লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে ? ২৫ শে বৈশাখে ওনার পুজো না করে কয়েকটা লাইন তো পারিস অনুবাদ করতে ? কাজ দিতো।

শ্রাবণের ধারার মত সমরের বাক্যবাণ বর্ষিত হতে থাকে।

: ওরে অনুবাদ হয় এবং হোচ্ছে। তুই আমি জানি না বলে অনুবাদ হচ্ছে না — এমন একেবারেই নয় — বলার চেষ্টা করে কৃষ্ণকলি।

কে শোনে কার কথা। সমর চলতে থাকে . . .

: দেখ্ না শরৎচন্দ্র কি ভাবে গুজরাটি আর মারাঠীদের মধ্যে পরিচিত। জিজ্ঞেস করলে দেখবি রবীন্দ্রনাথ ওরা পড়েই নি। তাই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি টবি বলে আর ন্যাকামো করিস না। বলে ঘর ছাড়ে সমর তড়িৎ বেগে।

কৃষ্ণকলি দুহাতে মাথার রগ চেপে বসে থাকে। ভেবেছিল এবার রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কিছু একটা করবে। কিন্তু সমরের খোঁচা মারা কথাগুলো যেন ওকে আমূল বিধিঁয়ে দিয়ে গেল। সত্যিই তো ও নিজে ইংরেজী সাহিত্যের ভালো ছাত্রী হোয়েও কতটা কি করেছে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তাগুলো অন্যভাষার লোকেদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ?

তবে অন্য ভাষার লোকজন রবীন্দ্রনাথকে চেনে না এটা কৃষ্ণকলি বিশ্বাস করে না। মাল্টি লিংগুয়াল ছাত্র ছাত্রীদের একটা গানের অর্গানাইজেশনে কৃষ্ণকলি গান শেখে। সেখানেই সে অবাঙালী, অভারতীয়দের জিজ্ঞেস করবে রবীন্দ্রনাথের কথা। দেখা যাক রবীন্দ্রনাথকে তারা কতটা জানে।

গানের ক্লাসে বিকেলে প্রথম Ann এর সঙ্গে দেখা। সে সুইৎজারল্যান্ডের মেয়ে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা বলতে পারে। আর কি কি যেন জানে সে। অপূর্ব গান গায়।

কৃষ্ণকলি গিয়ে এ্যানকে ধরে।

: এ্যান টেগোর সঙ সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে তোমার ?

: টেগোর সঙ ? হোয়াট সঙ ইস দিস ?

কৃষ্ণকলি খানিকটা হতাশ হয় । তবু হাল ছাড়েনা বলতে থাকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার জয় ও তার আনুষাঙ্গিক খবর গুলো ।

এ্যান্ বিস্মিত হয় জেনে যে সামান্য একজন বাঙালী লেখক প্রায় একশো বছর আগেই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছিলেন । ঠিক হয় কৃষ্ণকলি এ্যানকে গীতাঞ্জলী পড়াবে ।

তবে কৃষ্ণকলির অভিযান ব্যর্থ হয় না । স্কটিশ মেয়ে ডিওড্রি বললো –

: হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো টেগোর সঙ জানি,ওর একটা গান শুনেছি

কটোবার ও বেবেসিনু এ্যাপোনা বুলিয়া

বলে আশ্চর্য নিখুঁত সুরে 'ও কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া' গানটির প্রথম দুটি লাইন গেয়ে দিল । তারপর তার ইংরেজী ভার্সনটাও শুনিয়ে দিল ।

কৃষ্ণকলি আনন্দে ডিওড্রিকে জড়িয়ে ধরে ।

: সুপার্ব ডিওড্রি সুপার্ব ।

: তুমি আরো জানো কি তোমাদের টেগোর এই গানটার সুর একটা স্কটিশ গানের সুর থেকে নিয়েছিলেন ? আদৌ উনি এ্যাক্নলেজ করেছেন – কিনা আমার জানা নেই ।

অবশ্য অনেক বলে সুরটা নাকি Mozart-এর ।

যাক ওসব তর্কের কথা কৃষ্ণকলি তুমি একটা ব্যাড নিউস শুনেছো কি আজ ? এব্যাউট মাইকেল ? He passed ...

: এ্যাঁ-কৃষ্ণকলি শ্ক খায়, কবে ?

: আজ সকালে – পি, এ হসপিটালে ।

মাইকেল ওদের সহকর্মী । যতদিন ধরে কৃষ্ণকলি এখানে আছে তার দ্বিগুণ সময় ধরে মাইকেল এখানে কাজ করে । অনুবাদ বিভাগে । সাহিত্যের ছাত্র । কম্পারেটিভ লিটরেচারের ।

হৈ হৈ করা আমুদে মাইকেল স্বভাব কবি ছিল । যে কোনো অকেশনে ওরা মাইকেলের কবিতা শুনেছে । শুনে মজা পেয়েছে । হঠাৎ কিছুদিন আগেই ওর ক্যানসার ধরা পড়ে-ফুসফুসে । তখনই সবাই জানতো মাইকেলের দিন আর বেশী নয় । তবে এতো তাড়াতাড়ি এতো অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই তরুণ প্রাণবন্ত মানুষটির চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়বে এটা কেউ আশা করে নি ।

হঠাৎ বিদ্যুতের চমকের মতো সমরের কথা মনে পড়ে কৃষ্ণকলির । সমর – সমর এবার কি করবে ? ওতো মাইকেলের প্রাণের দোসর ছিল ।

: আগামীকাল মাইকেলের Funeral চার্চে-বিকেল তিনটে তে চলে এসো দেখা হবে। বলে ডিওড্রি ওর হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে চলে যায়।

কৃষ্ণকলি বাড়ী ফেরে। অবশ উদ্‌বিগ্ন মন নিয়ে। রাত কাটে তার বিনিদ্র।

পরদিন বিকেল তিনটে। চার্চে পৌঁছে গেল কৃষ্ণকলি। প্রবেশ পথে একটি ডেস্কে কমেন্টস বুক। কৃষ্ণকলি কি লিখবে ভেবে পায় না। সারি সারি চেয়ার পাতা। সামনের সারিতে ও দেখতে পায় সমরকে। উস্কো খুস্কো মাথার চুল — গালে না কাটা দাড়ি, মুখ নীচু করে বসে আছে। যেন বজ্রাহত। যেন তার সবচেয়ে নিকটাত্মীয়ের এই শোকসভা। হবে নাই বা কেন ? সমরের কলকাতার বাড়ীতে মাইকেলের ছিল অবাধ যাতায়াত। সমরের মাকে মাইকেল মা বলেই ডাকতো।

: আমাদের সার্ভিস এবার শুরু হোচ্ছে।

ঘোষকের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মাইকেলের জীবন সংক্ষেপে বলবেন ফাদার আর্নেষ্ট। তারপরে মাইকেলের শেষ ইচ্ছানুযায়ী সমর চৌধুরী তার এপিটাফটি সবাইকে পড়ে শোনাবেন। তিনি নিজেই তার এপিটাফটি নির্বাচিত করে গেছেন।

মাইকেল তার এপিটাফটি নির্বাচিত করে গেছে। অবাক হয় কৃষ্ণকলি। কতটা মনের জোর থাকলে মানুষ এটা পারে। সত্যিই কোনো কোনো সময়ে মানুষ তার মহত্ত্বে দেবতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

: . . . ক্যানসারে অনেকে অনেকদিন ধরেই ভোগে। কিন্তু মাইকেল ভুগেছে মাত্র সাত সপ্তাহ।

ফাদার আর্নেষ্ট থামলেন।

এবার সমর চৌধুরীকে বলা হচ্ছে এগিয়ে এসে মাইকেলের নির্বাচিত এপিটাফটি পড়তে।

সমর উঠে যায় মাইকের সামনে। কোনোরকম মুখবন্ধ ছাড়াই ভূতগ্রস্তের মত সমর পড়তে থাকে —

‘‘I have got my leave.

Bid me farewell, my brothers!

I bow to you all and take my departure.’’

আরে এতো রবীন্দ্রনাথ। শিউরে ওঠে কৃষ্ণকলি। গীতাঞ্জলী। কি যেন বাংলাটা ? কি যেন ? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে,

‘‘পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই

সবারে আমি প্রণাম করে যাই।’’

সমর পড়ছে। ততক্ষণে সে আর মৃত নয় — ভূতগ্রস্ত নয় — সমর উদ্দীপিত — সেও বুঝতে পেরেছে — এ রবীন্দ্রনাথের কবিতা —

‘‘Here I give back the key of my door . . .

and I give up all claims to my house.

I only ask for last kind words from you.’’

কৃষ্ণকলি আবৃত্তি করে :

''ফিরায়ে দিয়ে ঘরের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবী
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই''

দেখে সমরের চোখ দিয়ে জল পড়ছে দরদর করে। সে পড়ে যাচ্ছে –

''We were neighbours for long, but I received more than I could give …''

এতক্ষণে মুখ ঢাকে কৃষ্ণকলি। ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। পাশে ডিওড্রি ওর কাঁধে হাত রাখে। সেও কাঁদছে। সমর, ডিওড্রি, কৃষ্ণকলি সবার চোখের জল মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

'হ্যাঁ, আমি দোষ করেছি, বৌঠান
দু–দশখানা কবিতা অপরাধ
ঝড়ে উড়িয়ে দিইনি, বৌঠান
আমার যত কবিতা অপরাধ
তোমার কাছে যা কিছু প্রশ্রয়
সবই আমার কবিতা অপরাধ
আমাকে ভুল বুঝো না, বৌঠান
ফিরিয়ে নেবো তর্ক প্রতিবাদ
আমার কথা ভাবোনি, বৌঠান
ছাদের ঘরে ভেঙে পড়ল চাঁদ
সেদিন থেকে জীবন খানখান
ছাদের ঘরে ঝুলছে কালো চাঁদ'

আলো / দুই
জয় গোস্বামী

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.
I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

গানের ভিতর দিয়ে

শাশ্বতী ভট্টাচার্য

এপ্রিল ২০, ২০১০

'ভাই, ভাই, দেখ দেখ বসন্তের প্রথম কার্ডিনাল।' অনুপস্থিত বোনের কণ্ঠস্বর অয়নের কানে বেজে ওঠে।

তুষার ঝড়, রাস্তার দুইপাশে ডাঁই করে রাখা বরফের পাহাড় সরিয়ে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে আমেরিকার উত্তরে পশ্চিমাঞ্চলের চিপওয়া ফলস্ নামের ছোট্ট একটা শহর। খয়েরী গাছের ডালে ডালে দেখা দিচ্ছে ছোট ছোট সবুজ কুঁড়ি; ওগুলোর প্রত্যেকটার ভিতর লুকিয়ে আছে একটা চিকন সবুজ পাতা।

স্কুল বাস থেকে নেমে অয়ন মনে মনে হিসেব কষে। কোন রকমে আর কয়েকটা দিন। আর একটা পরীক্ষা, দুটো প্রজেক্ট, ব্যাস। তার পরেই শুরু হবে গরমের ছুটি। তিন মাস পরে যখন স্কুল খুলবে অয়ন তখন একজন ক্লাস টেনের ছাত্র হবে। আর তার আগে এই তিন মাস ধরে প্রতি সপ্তাহের শেষে বাবা-মা আর ছোট বোনের সাথে কোথাও একটা বেড়াতে যাওয়ার সময়। প্রতি বছরই নতুন হয়ে দেখা দেয় চিপওয়া নদী, কিম্বা ওল্ড-এব লেকের পাড় ধরে ঘুরে বেড়ানোর রাস্তাগুলো। বারম্বার দেখেও পুরনো হয়না এরভিং পার্ক, চিড়িয়াখানা, লেক উইচিটা স্টেট পার্ক। চাইকি চিপওয়া নদীতে বোটের ওপর, রোদের দিকে পিঠ করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে রবিবারের কয়েকটা অলস দুপুর।

বসন্তের আগমন জানান দিয়ে পিচের রাস্তার ওপর সরু সরু পা ফেলে হাঁটতে শুরু করেছে গ্রাউস পাখি। ইতস্তত উড়ে যাচ্ছে ডানায় লাল ডোরাকাটা দেওয়া রেড-উইং ব্ল্যাক বার্ড। দূরে কোথাও টুইঈ, টুই . . . রী রী রী করে একটা পাখি ডেকে ওঠে, একটা লাল রঙে রাঙানো ডানা অয়নের চোখের সামনে ঝলসিয়ে উঠে আবার কোথায়ও উধাও হয়ে যায়।

'ভাই ওই কার্ডিনালটা কি গান গাইছে বলত ?' 'গান ? ধুর ! গান কেন হবে ? সবাই কি কচিবানুর মতো ?' 'তুমি জানো না। ওরা সারাদিন নানা সুরে শুধু গান গায়। যেই ঠান্ডা চলে গিয়ে বরফ গলে যায়, আকাশে উড়তে উড়তে ওরা গান গায় – কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা . . .' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাখিদের ভাষা তুই খুব বুঝিস কিনা ! আমেরিকার পাখি রবীন্দ্র সংগীত গাইছে, পাগল আর কাকে বলে ?' ওর বোনের মাথায় নির্ঘাত 'ক্যাড়া ' আছে।

মাম্মি গান গাইতে ভালোবাসে। চেষ্টা করেও অয়ন গান শিখতে পারেনি, কিন্তু ছোটবানু অনায়াসে মাম্মির কাছে কঠিন কঠিন গান শিখে ফেলে, কথা-সুর ঠিক রেখে কচিবানু নিজের মনে গান গেয়েই চলেছে সারা দিন, ঠিক মাম্মির মতন করে।

কচিবানু আজ পাপ্পার সাথে ডাক্তার দেখাতে গেছে, হয়তো এতক্ষণে ওরা ঘরে ফিরেই এসেছে। বসন্তের প্রথম পাখির ছবি দেখতে পেলে কচিবানু ভীষণ খুশি হবে, ছবি তোলার জন্য পকেট থেকে ফোন বার করে পাখিটাকে খোঁজে অয়ন। কিন্তু তার আগেই ওর নজরে পরে ওদের বাড়ির সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে মিসেস ডিকারশন, ঠিক যেন অয়নের অপেক্ষায়। ওদের পরিবারের সাথে বহু দিনের চেনাজানা এক মাথা সাদা চুলের শান্ত সৌম চেহারার সদাশয়, পরোপকারি পড়শি মিসেস ডিরারশন কেন এখানে এই সময়ে ?

অকারণ অজানা ভয়ে অয়নের বুকের ভিতরটা ধুক-পুক করে ওঠে। গত রাত্রে নিজের শোওয়ার ঘর থেকেই ও মাম্মিকে কাঁদতে শুনেছে। পাপ্পার ভারী গলার সান্ত্বনার কথাগুলো ও ঠিক শুনতে না পেলেও বুঝেছে পাপ্পাও কাঁদছিলো। অয়নের ভয় হয়। তাহলে কি কচিবানুর ঘন ঘন ম্যারাথন জ্বর, সেরে গিয়েও আবার ফিরে আসে . . ., মামুলি একটা সর্দি-কাশি জ্বর নয় ?

আজ ডাক্তার দেখানোর পর — পাপ্পা-মাম্মি কি সেই রকম কোন একটা কারণ জানতে পেরেছেন ? সেই জন্যেই কি ওকে খবর দেওয়ার জন্য মিসেস ডিকারশন ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ? ওকে খবরটা জানানোর জন্য ? সে কি ওর বাবা মায়ের অনুরোধেই, নাকি মিসেস ডিকারশন নিজেই ওদের মানসিক পরিস্থিতি বিচার করে, ওদেরকে সাহায্য করার জন্য জেনে বুঝেই এই কঠিন কাজটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন ?

অয়নের সত্ত্বায় নেমে আসে কঠিন অনিবার্য এক উপলব্ধি । ওর হাত পা ঘেমে ওঠে । পাপ্পা আর মাম্মির এখন মানসিক অবলম্বন দরকার । হঠাৎ অয়নের ডঃ বোসের কথা মনে পড়ে যায় । তিন বছর আগে এক গরমের ছুটিতে দীপন আর ওর মায়ের সাথে অয়নের আলাপ হয়, চিপওয়া ফলসের বিখ্যাত পেটিং জু যেখানে জন্তু জানোয়ারকে খাওয়ানো যায়, ওদের শরীর স্পর্শ করা যায়, সেখানে একটা বাইসনকে ওরা দুজনেই একসাথে ছুঁতে পেরেছিল । অয়ন বড়ো হয়ে ডাক্তার হতে চায় শুনে দীপনের মা জানিয়ে ছিলেন উনিও একজন ডাক্তার । মজা করে বলেছিলেন, অয়ন যদি বড় হয়ে একজন 'পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলোজিস্ট' হতে চায়, বলা যায় না ওঁনার সাথে অয়নের আবার দেখা হয়ে যেতে পারে । সেদিন সেই শব্দটার তাৎপর্য অয়ন জানত না, কিন্তু ডঃ বোসের করুণাঘন চোখ আর ব্যক্তিত্ব ওর এতো ভালো লেগেছিল যে, ও ওঁনার ফোন আর ই-মেইল অয়ন এড্রেস যত্ন করে রেখে দিয়েছিল । কচিবানুর কি হয়েছে ?

অয়নের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, মিসেস ডিকারশন দুই হাত বাড়িয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন, 'মিলিয়ার কি হয়েছে ন্যানি ?' 'ঘরে এসো আগে, বলছি । চিন্তা করে না, দুঃশ্চিন্তা আমাদের দুর্বল করে দেয় । মিলিয়া ঠিক সেরে উঠবে । সামনের কয়েকটা মাস আমাদের যাত্রা কঠিন, কিন্তু আমাদের লক্ষ এক, আমরা কিছুতেই হারব না । শুধু কয়েকটা মাস, বড্ডো জোর এক-দুই বছর' ।

অথচ মাত্র সাত বছর আগেই অয়নের জীবনে কচিবানুর হঠাৎ আবির্ভাব অয়নের খুব একটা ভাল লাগেনি । ওর জানা ছিল মাম্মির পেটের মধ্যে একটা কথা-বলা চলা-ফেরা করা বেবি ডল আছে, কিন্তু সেটা যে এতো তাড়াতারি বাইরে এসে ভয়ানক শক্তিতে ওর ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জড়িয়ে যাবে সেটা ও মোটেও আন্দাজ করতে পারেনি । প্রথমতঃ জিনিসটা ভীষণ ছোট অথচ গলার জোর প্রচুর; এতো চিৎকার করে কাঁদতে পারে যে পাপ্পা আর মাম্মি সব সময় ওকে নিয়ে ব্যস্ত । তারপর যখন বেবিটা আর একটু বড়ো হলো, অয়ন নিজের থেকেই ওর ঘরের অর্ধেক ছেড়ে দিল তাতেও কিন্তু বেবিটার আচরণ একটুও পাল্টালো না । ওকে অয়নের কোলে নিতে ইচ্ছা হতো, কিন্তু দুষ্টু বেবি . . ., অয়ন কোলে নিলেই এমন লাফালাফি আরম্ভ করবে যে এই বুঝি পড়েই যায় । অয়নের রাগ হতো, বেবিটার সিভিক সেন্সটা একটু কমই ।

কিন্তু যেই দিন বেবিটা হাসতে শিখল, অয়নের রাগ কোথায় ভেসে গেল । কবে বেবির বদলে কচি বোনু, কিম্বা সেটা পাল্টে কচিবানু হলো, আজ আর মনে নেই অয়নের ।

হ্যাঁ স্কুলের খাতায় ওর নাম মিলিয়া, কিন্তু অয়নের কাছে ও কচিবানু ছাড়া কিচ্ছু নয় । ও যখন সেজে গুজে এক ঢাল শ্যাম্পু করা লম্বা চুল ছেড়ে অয়নের ঘরে আসে অয়নের মনে হয় ও বুঝি হ্যান্স এন্ডারসানের ফেয়ারি ল্যান্ডের পরী । তার ওপরে ও যখন চোখ বন্ধ করে গান গায়, অয়নের মনে হয় ও বুঝি হাওয়ায় ভাসছে, এক গুনী বোনের দাদার হওয়ার গর্বে ওর বুক ভরে ওঠে । অয়ন জানে ওর বোনের এই সংগীত প্রেম মাম্মি, দিদুনের দিক থেকে এসেছে, কিন্তু তবুও কচিবানু যখন মাথা দুলিয়ে গম্ভীর গলায় বলে বড়ো হয়ে ও ভারতবর্ষে গিয়ে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল গানের ক্লাস নেবে, কৌশিকী চক্রবর্তী হবে, বোনকে ঠাট্টা করতে অয়ন ছাড়ে না । মাথায় 'ক্যড়া' না থাকলে একটা আট বছরের মেয়ে এই সব বলে ?

হঠাৎ করে বড়ো দাদা, বড়ো ছেলের ভূমিকায় নিজেকে আবিষ্কার করে বুক ভরে নিশ্বাস নেয় অয়ন । ডঃ বোস বলেছিলেন, 'নলেজ ইজ পাওয়ার, বুঝলে ? জ্ঞানই শক্তি । পরিস্থিতি প্রতিকুল হোক বা অনুকুল, আগে থেকে জেনে রাখতে হবে । খেলার মাঠে নামার আগে আমাদের জানতে হয় চোট পেলে কি কি করনীয়, প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার আগে আমাদের বলা হয় প্লেনে কিছু গন্ডগোল হলে নিশ্বাস নেব কি ভাবে, জলে লাফাতে হলে লাইফ জ্যাকেট কোথায় আছে, ঠিক সেই রকম' । নিতান্তই সাধারণ কথা, কিন্তু ওঁনার বলার মধ্যে একটা বিশেষ জোর ছিল যেটা অয়নের ভাল লেগেছিল । স্থির করে আজ রাত্রেই ডঃ বোসকে যোগাযোগ করবে ও । বোনের কি হয়েছে এবং কি করনীয় সেটা জানার মাধ্যমে অয়ন বাবা মাকে সাহায্য করবে ।

মে ২০, ২০১০

আজ কচিবানুর চিকিৎসার প্রথম দিন। সকালে উঠেই অয়ন পাপ্পাকে জানিয়েছে, আজ স্কুলে না গিয়ে পাপ্পা-মাম্মির আর কচিবানুর সাথেই সারাটা দিন কাটাবে। মাম্মি কিছু বলার আগেই অয়ন জানিয়েছে এতে মিসেস ডিকারশনের পূর্ণ সমর্থন আছে। স্কুলের কাজ ? হ্যাঁ, সেটাও শেষ। পাপ্পা-মাম্মিকে বিব্রত না করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে কচিবানুর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করে গ্রীষ্মের ছুটির আগেই পরীক্ষা এবং প্রজেক্টের কাজ পুরো শেষ করে ফেলেছে ও। অতএব স্কুলের খাতায় ডাক্তারী-কারণ জনিত অনুপস্থিতি ওর মাপ হয়ে যাবে।

ক্যাফেটেরিয়া থেকে স্যুপ কিনে হাসপাতালের বাইরে একটা গাছের তলা বেছে নিয়ে বসে অয়ন। মেয়ো ক্লিনিকের একটা ছোট ঘরে পাপ্পা আর মাম্মি এখন কচিবানুর বিছানার দুই পাশে। কিছুক্ষণের জন্য ওরা থাকবে নিজেদের মতো, তার পর মিলে এক সাথে বাড়ি ফেরা। স্যুপটা এখনও বেশ হাত সওয়া গরম। এতক্ষণ ভিতরে ছিল বলে বোঝা যাচ্ছিল না, বাইরে এখনও একটা ঠান্ডা আমেজ আছে। হাতের হাল্কা সোয়েটারকে ভালো করে নিজের গায়ে জড়িয়ে নেয় অয়ন।

নাহ ঠান্ডা লাগলেই জ্বর হয় না, শরীরের প্রতিরোধ বাহিনী আছে না ? শরীরটা একটা দূর্গের মতো। প্রতিটি হাড় বিশেষতঃ মেরুদন্ড, কিম্বা পাঁজরের ভিতরে মজ্জার মধ্যে আছে প্রতিরোধ বাহিনীর কারখানা, ইমিউনিটি ডিপার্টমেন্ট। সেখানে সেনাবাহিনী জন্মায়, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, লড়াইয়ের কায়দা কানুন শিখে তারপর রক্তের ভিতর চলে আসে। একমাত্র ভালোমত তালিম নেওয়া বাহিনীই পারে বাইরে থেকে আসা শত্রু, জ্বর-জ্বারিকে ঠেকিয়ে রাখতে, কোথাও কেটে গেলে তাড়াতাড়ি তাকে সারিয়ে ফেলতে। কিন্তু মুশকিলটা হয়েছে, কচিবানুর সেই প্রতিরোধ বাহিনী কিছুতেই আর পূর্ণবয়স্ক হতে চাইছে না, অপরিণত অবস্থায় রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে অহেতুক ভীড় বাড়াচ্ছে। কিন্তু ওরা তো যুদ্ধ করতেই পারে না, তাইতো কচিবানুর খালি খালি অসুস্থ। ছুটকো কাটা কুটি থেকে ইনফেকশন। আজ জ্বর, কাল পেট ব্যথা, পরশু ভীষণ টায়ার্ড। কোন রকমে একটু-আধটু গান ও এখনও গায়, কিন্তু নতুন গান আর ওর শিখতে ইচ্ছা করে না।

ক্লান্ত বোনের মুখটা অয়নের চোখের সামনে ভাসে। বাড়ি থেকে হাসপাতালে আসার পথে গাড়িতে কচিবানু গুন গুন করে দিদুনের প্রিয় 'এই মণিহার আমার নাহি সাজে' গানটা গাইছিল। এর প্রতিটা লাইন অয়নের কণ্ঠস্থ, কিন্তু গাইতে গেলেই মাম্মির কথা ভেবে ওর চোখে জল এসে যাবে। দিদুনের মৃত্যুর তিন বছর পরে মাম্মি কি এখনও নিজের মায়ের অভাব অনুভব করে ?

বসন্তের আকাশের ধারে কাছে এক ফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। আকাশের এই তীব্র ঘন, ঝকঝকে নীলের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নিজেকে পাগল পাগল লাগে। ওই যে চিল, বাজ, কিম্বা ঈগল পাখিরা, ডানাগুলো দুই ধারে প্রশস্ত করে মেলে দিয়ে পরম আহ্লাদে ভেসে বেড়াচ্ছে ওদের মধ্যেও কি কোন পাগলামীর কোন লক্ষণ নেই ?

আজ যে মোট তিনটে অসুধ কচিবানুকে দেওয়া হলো তাদের কাজ নিষ্প্রয়োজন ওঁছা অপরিণত সেনাদের সংখ্যায় বাড়তে না দেওয়া। এই রকম চলবে কয়েক সপ্তাহ। হ্যাঁ, অসুধগুলোর প্রভাবে কচিবানুর আরো দূর্বল লাগবে, একটু আধটু চুল পড়ে যাবে। তা হোক, এর পরের পর্যায়ে কচিবানুর রক্তের মধ্যে দিয়ে ওর শরীরে যোগ হবে বিশাল এক সেনাবাহিনী, একদম ভাল করে তালিম নেওয়া রেডিমেড সৈন্যদল; তারা যে কোন বিদেশি বদমায়েশকে দেখতে পেলেই একেবারে দম্মাদম মার দিয়ে শেষ করে কচিবানুর শরীর থেকে সরিয়ে ফেলবে। তার মানে আর সর্দি লেগে জ্বর হবে না। ব্যাস্ কচিবানু কিয়োর, একদম সেরে যাবে। মাঝে মাঝে শুধু এই হাসপাতালেই এসে রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে যেতে হবে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ চলছে। এই রকম বড়ো জোর দুই বছর। তারপর ? তারপর 'লাইফ অল গুড' ! অয়ন কলেজ যাবে, কচিবানু আরো ভালো গান গাইবে, মাম্মি আর পাপ্পা কখনও আমেরিকা কখনও ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়াবে, দুই ভাই-বোনের মধ্যে।

ইঞ্জেকশনের সূচটা হাতে ঢোকানোর ঠিক আগে কচিবানু ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে মাম্মিকে একটা গান গাইতে বলেছিল। কি অদ্ভুত সেই গান, 'নয় নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারা জীবন সকাল সন্ধেবেলা'। কি আশ্চর্য — 'তোমার প্রেমে আঘাত আছে নয়কো অবহেলা', লাইনটা গাইতে গিয়ে মাম্মি যখন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল, আর কচিবানু মাম্মির হাতে হাত রেখে গেয়ে উঠেছিল, 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই

মরব না ।' মাম্মি কান্না থামিয়ে শান্ত হলো, কচিবানুকে চুমু দিল । কথাগুলো অয়নের খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু যখন দেখল, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশীয়ান, ওরা কি বুঝল কে জানে — সবাই মিলে চোখের জল মুছছে, অয়ন আর থাকতে না পেরে পাপ্পার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ।

জুলাই ২৪, ২০১৩

বারান্দায় একটা ছোট চায়ের আসরে আমরা পাঁচজন । সূর্যাস্ত হলো বলে, কাঠের পাটাতনের আড়ালে ঘন সবুজ মাঠ, শতাধিক পাখি-পোকার সমবেত কলতান । ছোটবানু দাদাকে একটা ঠেলা দেয়, 'ব্রাদা, গান গাও না একটা ?' মাথা উঁচু করে বসে অয়ন, 'ঠিক আছে, শুধু তোর জন্য ।' শুরু করে — 'কান্না হাসির দোল-দোলান পৌষ ফাগুনের পালা, তার মধ্যে চির-জীবন বইব গানের ডালা ।' লাইনটা শেষ করার আগেই অয়ন কেঁদে ফেলে, কাঁদ কাঁদ গলায় যোগ দেয়, 'এই কি তোমার খুশি ? আমায় তাই পরালে মালা ?' বিকেলের সোনালি রোদ আমাদের সবাইকে এক গভীর প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে ফেলে, এই জগতের বাইরে কোন এক অন্য জগতে উত্তরণ ঘটে আমাদের ।

কলেজ এডমিশনের খবর এসে গেছে, প্রায় অভাবনীয় ভাবে হারভার্ড ম্যাসাচুয়েটসে পড়ার সুযোগ পেয়েছে । আর এক মাস পরেই পাপ্পা, মাম্মি, ছোটবানু সবাইকে চিপওয়া ফলস-এ রেখে অয়ন চলে যাবে বহু দূরে । গ্র্যাজুয়েশন পার্টি যবে হবে হোক, তার আগে অয়ন চায় ডঃ বোসের সাথে ছোটবানু, পাপ্পা, মাম্মি আর মিসেস ডিকারসনের সাথে আলাপ হোক ।

তাই অয়নদের চিপওয়া ফলসের বাড়িতে আজ আমার নিমন্ত্রণ । হ্যাঁ, আমিই উপরোক্ত কাহিনীর ডঃ বোস । কাজের অজুহাতে দীপন আর ওর বাবা, আরেক ডঃ বোস আসতে পারেনি ।

ছটফটে ছোটবানু স্কুলের টেবিল টেনিস টিমের ক্যাপটেন, স্কুলের মিউজিক টিমের একজন উজ্জ্বল তারকা । পড়াশোনা ছাড়াও মায়ের কাছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম এবং পশ্চিম ক্লাসিকাল অপেরার চর্চাও সে সমান পারদর্শীতায় চালিয়ে যাচ্ছে । আমার অনুরোধে ও দুটো গান গেয়েছে, এবার মাম্মির অনুরোধ । ছোটবানু মায়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে 'প্রমিস করো তুমি কাঁদবে না' । মায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওর সুরেলায় গলায় ধরে, 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না, যাক না . . .'

অয়ন আমায় ফিসফিস করে বলে 'এটা মাম্মির প্রিয় গান, যেই দিন ডাক্তার বললেন আর কিমো নিতে হবে না, সেইদিন মাম্মির এই গানটা ছোটবানুকে শেখান ।'

নাহ, আর কিমো নিতে হয়নি, কচিবানুর শরীরে স্টেমসেল ট্রান্সপ্লান্ট ট্রিটমেন্ট দারুণ কাজ দিয়েছে । কচিবানু এখন একশ শতাংশ সুস্থ ।

গানের ভিতর দিয়ে জীবন দেখতে পেয়েছে ছোটবানু এবং ভালোবেসেছে ।

Vincristine (previously Oncovin), used to treat acute lymphocytic leukemia (ALL), is one of the most effective and safe medicines and is in the World Health Organization's List of Essential Medicines. It is a Vinca alkaloid that can be obtained from the Madagascar Periwinkle *Catharanthus roseus* .The drug was initially discovered by a team led by Dr. J.G. Armstrong, then marketed by Eli Lilly and Company. Eli Lilly required one ton of dried leaves to produce one ounce of Vincristine.

Catharanthus roseus

শাশ্বতী ভট্টাচার্য — যাদবপুর ইউনিভার্সিটির কেমেষ্ট্রিতে মাস্টার্স করে CSIR-এর স্কলারশীপে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটুট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজিতে পিএইচডি-র কাজ করেছেন । মেরিলান্ডের ন্যশানাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে পোস্ট ডঃ করে এখন ইউনিভার্সিটি অফ উইস্কনসিন, ম্যাডিসনে সায়েন্টিস্ট । ওর জীবনের অল্প কয়েকটা আফসোসের একটা হল, সায়ন্সকে জীবিকা নির্বাহ করার উপায় অবলম্বন করায় ওর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজটা একটুর জন্য হাত ছাড়া হয়ে গেলো ।

‘‘প্রভাত বেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ গুচ্ছ’’

ধারাবাহিক সংখ্যা

‘বাতায়ন’-এর নতুন সংযোজন ‘ধারাবাহিক সংখ্যা’ । এই বছরে পুজোর আগেই আমাদের ধারাবাহিক সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হবে ।

ক্লিভল্যান্ডের শ্রী সুজয় দত্তের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় আমরা বন্ধু হিসাবে পেলাম প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী নবকুমার বসু কে । অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর নতুন উপন্যাস ‘হটাবাহার’ নববাবু টিম ‘বাতায়ন’এর হাতে তুলে দিয়েছেন । ‘হটাবাহার’ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উপন্যাস যা প্রবাসী জীবনে বাঙ্গালীদের অনুভূতি ও পরিস্থিতির কথা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছে । সাহিত্যিকের দক্ষ রচনাশৈলী এই উপন্যাসকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে । অনেক পাঠকেরই মনে হবে এটা তাঁদের জীবনের সাথে জড়িত । ‘হটাবাহার’ পাঠকদের আপ্লুত করবে, চিন্তিত করবে এবং অভিভূত করবে নিশ্চয়ই ।

স্বল্প দিনের অপেক্ষায় থাকুন, বাতায়ন পড়ুন আর সঙ্গে থাকুন ।

শ্রী নবকুমার বসু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ‘বাতায়ন’-এর জন্য ‘হটাবাহার’-এর সারাংশ লিখে দিয়েছেন । আমাদের এই বিশেষ বন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

''হটাবাহার'' উপন্যাস সম্পর্কে

সাহিত্যের থেকে জীবন বড় । সেই জীবনদর্শনে একটা মাত্রা আসে লেখকের কল্পনায় । তাঁর কাজ লেখা । সুতরাং দর্শন আর কল্পনার যুগলবন্দী তখন লেখার মাধ্যমেই হয়ে ওঠে সাহিত্য । জীবন একাকার হয়ে যায় তারমধ্যে । কোথাও একটা দায়বদ্ধতা বুঝি আপনি মিশে যায় ওই সবকিছুর সঙ্গে । মিশে যায় . . . নাকি মিশেই থাকে সচেতন লেখকের ভাবনায় । নিশ্চয়ই তাই । তা নয়তো খেই হারাতো গল্প-উপন্যাস ।

হটাবাহার — উপন্যাস বর্তমান লেখকের এক নিবিড় দর্শন, কল্পনা এবং সংহত দায়বদ্ধতার সাম্প্রতিক বাস্তব আখ্যান তথা উপন্যাস । প্রবাসী বাঙালি জীবন এই উপন্যাসের আধার; কিন্তু পটভূমি ছড়ানো ইংল্যান্ড থেকে বাঙালির স্বদেশ পশ্চিমবঙ্গ . . . কলকাতা শহর ও মফস্‌সল । নায়িকা-ই উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র । তিনি সুদীপা ।

প্রবাসী জীবনযাপনের পূর্ণলগ্নে সুদীপার আকস্মিক-বিভ্রান্ত-অপ্রস্তুত অনুভব — তাঁর মাথার ওপর থেকে ছাদ অন্তর্হিত । চিকিৎসক স্বামী রজতাভ আচমকা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে প্রয়াত । মধ্যবয়সী জীবনের যুগসন্ধিতে দিশাহারা সুদীপা ।

অথচ জীবন বহমান তারপরেও । এবং স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আকাংখা । শুরু হয় স্বদেশ-প্রবাসে জীবন ভাগাভাগির এক দুরন্ত টানাপোড়েন ।

দিনে দিনে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, বিধ্বস্ত, বিস্মিতও বুঝি এক নতুন নারী সুদীপা । সমাজ বন্ধু-আত্মীয়তা সম্পর্ক এবং স্বদেশ . . . সবই প্রতিভাত হয় অর্জিত নতুন ভাবনায়, দৃষ্টিতে, আচরণে । অনেক বছর আগে দেশ ছেড়েছিলেন অন্য আর এক পারঘাটায় তীরভূমির সন্ধানে । জীবন সেখানে মাটি পেয়েছিল পায়ের নিচেয় । কিন্তু আসল মাটির টান ফুরিয়ে গিয়েছিল, তা তো নয় । সেই মাটিই তো স্বদেশ; জীবনের শিকড় প্রোথিত ছিল তার গভীরে । ক্রমশই বুঝি আর এক নতুন স্বদেশ উন্মোচিত হয় সুদীপার চোখের সামনে । বিহ্বল, বিপর্যস্ত মহিলার নিত্যদিনের দেখা আর জানায় প্রশ্ন উঠে আশে, এ কোন স্বদেশ ? এ কোন্ সমাজ, আত্মজন, বন্ধু ! এ যে তাঁর অজানা, অপরিচিত এক বিজনপুরী যেখানে বিরল হয়ে গেছে ভালবাসা, ঠুনকো হয়ে গেছে মূল্যবোধ . . . আপনজন-ই হরণ ক'রে নিচ্ছে নিজের অধিকার । শারীরিক-মানসিক-অর্থনৈতিক । পরোক্ষভাবে বিতাড়নের পথ নির্দেশ করে নিজেরই জন্মভূমি ।

কার কাছে কোথায় যাবেন সুদীপা ? কোন দেশে ? কে তাঁর স্বজন, কোনটা তাঁর স্বদেশ ?

কাহিনি আর ঘটনার নিবিড় বুনোটে এক স্তব্ধ অথচ অনিবার্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় শত সহস্র প্রবাসী মানুষকে । 'হটাবাহার' উপন্যাস এক মৃত্তিকা-সংলগ্ন বাস্তব জীবনের আন্তরিক উন্মোচন ।

ওপরতলার জানালায়

ইন্দ্রাণী মন্ডল

ওপরতলার জানালায় চোখ রাখব বলে
ফেলে এসেছি সমতল,
সুনির্দিষ্ট বাঁকে দিনচালনের বিপুল গতি
দূর থেকে আহরণ করব বলে
বেছে নিয়েছি নিঃসঙ্গ চড়াই
আর অদ্ভুত অনিশ্চয়তা,
যেখানে নেই এগোনো-পিছনোর পথ
শুধু ধুকধুকে বর্তমান . . .

মিটমিটে আলো, টিপটিপে বৃষ্টি,
স্বল্প পরিসর ঝাপসা অভিমুখ দেখব বলে
ফেলে এসেছি পরিপাটি
অপর্যাপ্ত পরিমন্ডল . . . . . .

দূরপাল্লার রেলগাড়ির রাতকাঁদানো গুমরে
গন্তব্য সব
বিস্তস্ত্র টুকরোয় ছিন্ন . . . . .
ছড়িয়ে, ছিটিয়ে, ছিটকে আসে অপ্রস্তুত অবয়বে ।
সেসব খন্ড সুখ, খন্ড মুখ পাগল জুড়ব বলে
দিন ফেলে এসেছি, রাতও,
জাগরণ ভেঙে ফেলেছি, ঘুমও,
আলোর হদিশ, অন্ধকারের মানে
ভুলে এসেছি দুটোই,
মৃত্যু নয়, জীবন নয়
ক্রমান্বয় আতঙ্ক-শব্দভেদী
হৃৎকপাটে কড়া নাড়ার প্রতিধ্বনি শুনব বলে,
ছন্দবদ্ধ মিলনান্ত ছেড়ে
অনমনীয় অমিত্রাক্ষর বেছে নিয়েছি ।

ওপরতলার জানালায় চোখ রাখব বলে
সমতল ফেলে এসেছি . . . . .

Indrani Mondal studied in Calcutta and Jadavpur Universities, India, and holds a PhD in Philosophy and Social Studies. A freelance writer in both English and Bengali, over the last decade Indrani has written fiction, nonfiction and poetry mainly on social and cultural issues facing immigrants and has published three books of poetry "Fugitive Wings", "Pratidin Sati Hoi" and "Raater Sarir". She is an active member of the Chicago Creative Circle, Unmesh and is the current coeditor of a bilingual online newsletter.

খুঁজতে গিয়ে

স্নেহাশীস ভট্টাচার্য

মেঘবালিকা কোথায় থাকিস ?
কখন খেলিস কোথায় পড়িস ?
কালকে তোকে খুঁজতে গিয়ে
কলেজ স্ট্রিট আর গড়িয়াহাটে,
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো ।।

বাদলধারা অঝোর ঝরে
তোর চোখেতে তোর মুখেতে ।।
একছুটতে মেঘটাকে তাই
দিলাম গিয়ে জোরসে বকে ।।
সূয্যি মামা বেজায় হেসে
রং ছড়ালো মেঘের বুকে ।
মেঘবালিকা হালকা হেসে
ধর্মতলার সমাবেশে ।।।।।
মেঘবাবাজী পসরা সাজায়
হগ সাহেবের নিজের ডেরায় ।।
মেঘবালিকা তোর খোঁজেতে
পাতাল পথই ভরসা যোগায় ।।।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য । কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী । বর্তমানে কলকাতা দুরদর্শন ভবনে কর্মরত । বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা । পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে । সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

মানো তো দেও, নহি তো পত্থর

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

তেরো-চোদ্দ বছরের এক কিশোরী। মন্দির প্রাঙ্গনে বসে বসে দেখছে। আগস্ট মাসে মনসূনের অবিরত তুমুল বর্ষণধারা উপচে পড়ছে। গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতীকে একাধারে ধরে রাখা সঙ্গমের পাড় ভেঙ্গে জল থৈ থৈ করছে ত্রিবেণীর বাঁধ এলাকা। ফুলে ফেঁপে উদ্দাম ছুটে আসা বন্যার জল ধেয়ে আসছে মন্দিরগুলোর সিঁড়ি বেয়ে। আর সেই জলপ্রবাহ সামলাতে সামলাতে আশপাশের ছোট ছোট খাবারের দোকানগুলোর অবস্থাও হয়ে উঠেছে শোচনীয়। অবশ্য ওদের ব্যবসায় ভাটা পড়েনি বিন্দুমাত্র। অবিরত আসতে থাকা ভক্তদের নানা দাবি মেটাতে গিয়ে দোকানীদের ব্যস্ততা ঠিক আগের মতনই। পুজো দেবার জন্য, ফল, ফুল, ফুলের মালা, নারকোল, ধূপকাঠি, সিঁদুর, মিষ্টি প্রভৃতি কেনার জন্য ভক্ত সমাগম হচ্ছে যেমন অনর্গল, তেমনি পূজা সমাপন ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে খাবারের সন্ধানে দোকানগুলোর সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনের কচৌড়ি, আলুসব্জি, সামোসা, দুধ-জলেবী, লড্ডু, পেড়া ইত্যাদির চাহিদাও অফুরন্ত। ভক্ত এবং ক্রেতাদের শোরগোল একযোগে গুলজার ক'রে রেখেছে চারিদিক।

কিশোরীর ওসবে আগ্রহ নেই। গভীর মনোযোগে সে চেয়ে আছে জলে নিমগ্ন, পাতাল শয্যায় শায়িত মহাবীরের বিশাল মূর্তিটার দিকে। দিব্যি টানটান শুয়ে আছেন ফুলে ঢাকা সঙ্কটমোচন।

পাঁচ শত বছর পূর্বে, আকবরের সময়ে নাকি লাল পাথরের এই বিশাল মূর্তিকে একদিন অকস্মাৎ সঙ্গমের পাড়ে শায়িত দেখেছিলেন স্থানীয়রা। তারপর জল থেকে তুলে শহরে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আগ্রহী ভক্তদের সব প্রয়াস নিস্ফল ক'রে, মহাবীরের এই বিশাল মূর্তি ক্রমশঃ মাটির তলায় ধসে যেতে থাকল। বিরতি ঘটল তাঁকে গঙ্গার কিনারা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায়। মাটি থেকে প্রায় দোতালা নীচে পাকাপাকিভাবে শয়ান হলেন তিনি।

সূর্যাস্তের সাথে হাল্কা নীল আঁধার তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে। মন্দির গুলোতে ধ্বনিত হচ্ছে শঙ্খধ্বনি। কাঁসরঘন্টার আওয়াজ। আরতির সঙ্গে ভক্তদের ভজন, সমবেত সুরে মুখর করে তুলছে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ধুপ-গুগ্গুলের সুবাসে ম' ম' ক'রছে বর্ষার স্পর্শ-স্নিগ্ধ বাতাস।

খানিক দূরে, যমুনা নদীর উপকুলে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে সম্রাট আকবর-নির্মিত কেল্লা, পাঁচশ' বছরের কত সহস্র উৎসব, সমারোহ, আনন্দ, বিলাসিতা, উশৃঙ্খলতা – প্রতিশোধ, জিঘাংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাক্ষ্য বহন ক'রে। নিস্তব্ধ। বিষণ্ন।

প্রতি বছরই এই ত্রিবেণীর পাড় ভেঙ্গে জাহ্নবী চলে আসেন মহাবীরের মন্দির প্রাঙ্গনে। ঘেরা বারান্দা অতিক্রম ক'রে কতগুলো সিঁড়ি পার ক'রে নেমে গিয়ে পুণ্য সলিলে নিমজ্জিত করেন শায়িত বজরঙ্গবলীকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

কিশোরী চেয়ে চেয়ে দেখছে। স্যাঁতসেতে হাওয়ার ছোঁয়ায় থিরথির ক'রে কাঁপছে গঙ্গার জল। আর সেই জলের ওপর তারার মত, ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে শত শত প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো।

অপার্থিব সেই দৃশ্য। ধূপ-ধূনোর গন্ধ মিলেমিশে যাচ্ছে কিশোরীর শ্বাস-প্রশ্বাসে। কাঁসর, শাঁখ ও ঘন্টা একযোগে ধ্বনিত হয়ে স্বর্গীয় পরিবেশ আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে তার চেতনা।

শৈশবে মাতৃহারা এবং ভাইবোন – বঞ্চিত সেই কিশোরী ভারি একা। কাকার সৌজন্যে, শায়িত এই মহাবীরের সঙ্গে ওর সৌহার্দ্য ঘটেছিল অতি শৈশবে। এখন সে নিজেই একা চলে আসে তাঁকে দেখতে। মেয়ে ব'লে ব্রহ্মচারী মহাবীরকে

স্পর্শ করা তার বারণ। মূর্তির খানিক দূরে, এক কোণে বসে নিজের মনে হনুমান-স্তব করে দীর্ঘক্ষণ। সে শুনেছে কলিযুগেও হনুমানজী অমর। জীবিত প্রাণীর মতনই বিচরণ করেন সর্বত্র। তাঁকে নাকি চিনে নিতে হয়।

মন্দিরের পুরোহিত বলেন তিনি নিজের চোখে একাধিকবার দিব্যদর্শন করেছেন। মাঝে মাঝে গভীর রাতে, দ্বিজবেশ ধারণ ক'রে হনুমানজী এই মন্দিরে আসেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত ধ্যানমগ্ন থাকেন। আবার সূর্য্যোদয় হলেই মিলিয়ে যান।

কিশোরীর বড় আশা একদিন সেও দ্বিজবেশে তার ইষ্টদেবকে দেখতে পাবে। কথা বলবে তাঁর সঙ্গে। পুরুত ঠাকুর বলেন, ''মানো তো দেও, নহি তো পত্থর''। তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলে তোমার কাছে তিনি দেবতা, নতুবা প্রস্তরখন্ড মাত্র।

— মাই জী, কাফী দের হো চুকি হ্যয়, জল্‌দি চলিয়ে। ''সুরেশ তাড়া দিল আবার। তার ওপর এলাহাবাদ থেকে ওঁদের কাশী নিয়ে যাবার ভার পড়েছে। কাশীর এক মস্ত বড় প্রাইভেট ব্যবসা সংস্থানের কর্মচারী সুরেশ। সন্ধ্যে হবার আগেই অতিথিদের কাশীতে মালিকের ডেরায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ওর।

হুটোপুটি, তাড়াহুড়ো ক'রে মল্লিকা আর পূর্ণেন্দু বেরিয়ে পড়লেন সুরেশের সঙ্গে। বিদেশ-প্রবাসী এঁরা। ভারতে এলে বাসস্থান কোলকাতাই। তবে মল্লিকার পীড়াপিড়িতে বহু বছর পর এবার, এলাহাবাদ আসা হ'ল কয়েকদিনের জন্য। মল্লিকার বাপের বাড়ির শহর। এত বছর পরেও এলাহাবাদের স্মৃতি-মুক্ত হতে পারেন নি তিনি।

মল্লিকার দিদি দুঃখ ক'রলেন, ''এতদিন পর এলি, অথচ বাঁধের লেটে-হুয়ে মহাবীরজীর দর্শন হ'ল না তোর''।

— না ডাকলে আর যাই কি করে ? হাজার-হাজার ভক্তের ভিড়ে আমাকে ভুলেই গেছেন তিনি'', বলে গাড়িতে উঠে বসলেন মল্লিকা।

— সীধে বনারস চলেঁ ? কঁহি রুক্‌না তো নহি হ্যয়, মাইজী'', ড্রাইভারের জিজ্ঞাসা।

— না কোথাও থামতে হবে না। সোজা বেনারস চলো। বিকেল হবার আগে পৌঁছতে হবে'', পূর্ণেন্দু বললেন।

এযাত্রা আর তোমার সঙ্গে দেখাই হ'ল না ! আর কখনো কি ফিরে আসা হবে !'' মনে মনে বললেন মল্লিকা। আর তখনি, বহু বছরের পুরোনো এক স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে পড়লেন।

একদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কিশোরীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল কপালের ওপর হাতের মৃদু স্পর্শে। চোখ খুলে সে দেখেছিল, মাথার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বিজবেশী সেই দিব্যপুরুষ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়া চন্দনচর্চিত দেহের সুগন্ধ জানিয়ে দিয়েছিল তাঁর আগমন। হাত বাড়িয়ে, আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, তিনি তার কপাল স্পর্শ করেছিলেন আবার। আত্মহারা কিশোরী করজোড়ে, স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠেছিল,

কণক ভূধরাকার সরিরা, সমর ভয়ংকর অতি বলবীরা।

পর্বতসম শক্তিমান, দীর্ঘদেহী, কণকের মত গাত্রবর্ণ যাঁর এবং যে মহাবীর সমরক্ষেত্রে অতি ভয়ংকর — স্বয়ং তিনিই যে ওর সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিশোরীর তাতে কোন সন্দেহ ছিল না সেই মুহূর্ত্তে। অপেক্ষার অবসান হয়েছিল। পূর্ণ হয়েছিল মনোবাঞ্ছা।

গভীর চিন্তায় কতক্ষণ মগ্ন ছিলেন মল্লিকা, নিজেই খেয়াল করেন নি। গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষে থামতে চমকে, সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণেন্দুও। বিরক্ত হয়ে বললেন, ''কেয়া হুয়া ?''

— ত্রিবেণীতে লেটে-হুয়ে বজরঙ্গবলীকে দর্শন না ক'রেই প্রয়াগধাম ছেড়ে চলে যাবেন ?'' ড্রাইভার বলল, ''ইয়ে ক্যসে হো সক্‌তা হ্যয়, ভলা ?''

মহাবীরের মন্দিরের একেবার তোরণ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে গাড়ি । কয়েক মিনিটের মধ্যে সুরেশ ছুটে গিয়ে পুজোর সব উপকরণ কিনে আনল ।

মল্লিকা, যার অন্তরে এখনো লুকিয়ে আছে মহাবীর- মগ্ন সেই কিশোরী, মন্দিরে প্রবেশ ক'রলেন । আবার কতদিন পর । তবে এবার আর মনসুনের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় না, মাঘমাসের কুয়াশায় ঢাকা এক সকালে ।

দীর্ঘকাল পরে এখানে এসে এলাহাবাদ-বাসীদের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেছিলেন মল্লিকা । মানুষের মন বদলেছে । সাজ-পোষাক বদলেছে । বদলেছে তাদের মূল্যবোধ । এমন কি শহরটার চেহারাও নতুন রূপ নিচ্ছে ।

অথচ, এই মন্দিরে ঢুকেই তিনি টের পেলেন মহাবীর একটুও বদলে যান নি । অপরিবর্তিত রূপে তিনি এখনও চিরন্তন । আর মন্দির প্রাঙ্গনে ঢুকে সেই প্রাচীন মূর্তিকে ভক্তরা যখন পুজো করেন, তাঁরাও বিস্মৃত হন জীবনের পরিবর্ত্তনশীলতার কথা । অন্ততঃ কিছুক্ষণ তাঁরা অপরিবর্তিত, অবিনশ্বর সেই ইষ্টদেবকে অনুভব করেন অন্তরে । সাধ্য কি আজকের জীবনযাত্রা অথবা আধুনিক টেকনলজি স্পর্শ করে তাঁদের সেই মুহূর্ত্তগুলো ।

খুব কাছ থেকে দর্শন করার সুযোগ মিলে গেল ওঁদের । পুজো দেবার মুহূর্ত্তে, মহাবীরের বিশাল দুই চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাইলেন মল্লিকা ।

— আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চলে যাচ্ছিলি ?'' সহাস্যে, সকৌতুকে মহাবীরের দু'চোখ ভাষামুখর হ'ল ।

— যাওয়া আর হলো কই ? তুমি যে মাঝপথ থেকে টেনে আনলে !'' করযোড়ে বললেন মল্লিকা ।

কত বছর আগে এই মন্দিরের পুরোহিত বলেছিলেন, ''মানো তো দেও, নহি তো পথর'' । তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেতোমার কাছে তিনি দেবতা, নতুবা প্রস্তরখন্ড মাত্র ।

কথাগুলোর সত্যতা আবার নতুন ক'রে মর্মে মর্মে অনুভব করলেন মল্লিকা ।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহরে । এলাহাবাদে শৈশব এবং ছাত্রজীবন অতিবাহীত । বিবাহের পর স্বামীর হাত ধরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসা । দীর্ঘকাল এই দেশে মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা অতঃপর ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. । মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা ।

বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থেকেছেন অনেকগুলো বছর ।

দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান — সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা । উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে ।

অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন । ভালবাসেন ভ্রমণ । পরম উৎসাহে বিদেশের মাটিতে বড় হয়ে উঠতে থাকা ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত রিডিং মেটিরিয়াল তৈরি করেন ।

এতাবধি ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ — অভিযান (আনন্দ প্রকাশিত), মায়াজাল (আনন্দ প্রকাশিত), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories - translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers) । আরো দুটি উপন্যাস আপাততঃ প্রকাশকের দপ্তরে জমা । আমার ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

মায়ের ডায়েরী থেকে

পিয়ালী গাঙ্গুলি

এই শোন, এখন রাখছি, তোকে ফোন করব। আমি এখন হনুমানের লেজ তৈরি করছি। গৈরিকা কিছুই হয়ত বুঝল না। ভাবলাম যখন ফোন করব, তখন বলব। কথা বলব কি করে ? সন্দেশের তো আর তর সইছে না। এই মুহূর্তে সে হনুমান। হাতে বেলুনের গদা। আমি আমার সুতির ওড়না দিয়ে তার লেজ বানাচ্ছি। এবার তাতে আমায় নকল আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। তাই দিয়ে তিনি লঙ্কা কান্ড করবেন।

এখন নিজেই নিজেকে দুষি। কি মরতে যে দেড় বছর বয়সে মহালয়া দেখিয়েছিলাম আর মহিষাসুরমর্দিনীর গল্প শুনিয়েছিলাম। সেই থেকে শুরু। দেড় বছর বয়স থেকেই সন্দেশ অনর্গল কথা বলে, গোটা বাক্য গঠন করে। উচ্চারণ গুলো একটু ভাল হত, কিন্ন, বিন্ন এসব বলত। প্রথম বার মহালয়া দেখে সে কি উত্তেজনা ! মা দুগ্গা, অসুর, লায়ণ, বাপরে — চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে উত্তেজনায়। ওর উৎসাহ দেখে আমিও ওকে পৌরাণিক কাহিনী শোনাতে লাগলাম। অমরচিত্রকথাও পড়ে শোনাতাম। নিজের জ্ঞানের ভান্ডার তো সীমিত, তাই যখন তখন গুগলকে স্মরণ করতে হত। কি করব ? গল্প বলা ছাড়া দস্যু ছেলেকে শান্তভাবে বসিয়ে রাখার আর কোনো উপায় নেই।

এরপর আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। ছেলে রাইমস শিখবে বলে তার বাবা ডি টু এইচ কিডস চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে। সেখানে প্রায় সারাদিনই মাইথোলজি চলে। ছেলে আমার ক্রমশ মাইথোলজি বিশারদ হয়ে উঠেছে। ওইটুকু ছেলে, তার কার্টুনে উৎসাহ নেই। সারাদিন সে কখনো রাম, কখনো রাবণ, কখনো কৃষ্ণ বা হনুমান, আবার কখনো গনুদাদা বা মহাদেব। মহাদেবের জন্য তার জেঠু বেনারস থেকে ডমরু নিয়ে এসেছে, পাড়ার মেলা থেকে মহাদেবের গলার রাবারের সাপও কেনা হয়েছে। সেসব নিয়ে তিনি প্রায়ই মহাদেবের মত তান্ডব নৃত্য করেন। তবে তার সবচেয়ে পছন্দ কিন্তু গনুদাদাকে। খুব ইচ্ছা কৈলাসে যাওয়ার। অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি। বলেছি কৈলাসে খুব ঠান্ডা। বা বা ব্ল্যাক শিপ আগে তিন ব্যাগ উল আনুক, তাই দিয়ে সোয়েটার বুনে তারপর আমরা যাব। এই রে . . . আবার কি করেছে। শাশুড়ি আমার নাম ধরে চেঁচাচ্ছে।

সারাদিন পর এই আবার লেখার সুযোগ পেলাম। এই নিয়েই বেঁচে আছি। দিনদিন হতাশার ঘন, কালো মেঘ মনের মধ্যে চেপে বসছে। এই একাকীত্বের জীবনে শেষ আশা ছিল ছেলে। ভেবেছিলাম ছেলে আমার সঙ্গী হবে। তা তো হলোই না উল্টে এখন ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। সবরকম শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে সন্দেশ। এই তো তখন সবকটা জলের বোতল খুলে মেঝেতে জল ঢালছিল। ঠাম্মা বারণ করেছিল বলে ঠাম্মাকে ঘুঁষি মেরেছে আর বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটা নিয়ে এসেও মেরেছে। আমি থাকতে না পেরে দু'ঘা লাগিয়ে দিলাম। সারদিন আমিও আর পেরে উঠি না। সোফার মাথায় হাঁটছে, দিনে একশো বার কুশানগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে, গাড়ি ধোয়ার পাইপ বারান্দা থেকে টেনে আনছে, মডিউলার কিচেনের হ্যান্ডেল বেয়ে উঠে গ্যাসের বার্ণার অন, অফ করছে, ছুরি নিয়ে নিচ্ছে। একদিন তো প্রায় পায়ের উপর গ্যাসের সিলিন্ডার ফেলে দিয়েছিল।

এই অবধি পড়ে সন্দেশ ডায়েরীটা বন্ধ করে বুকের ওপর রাখল। মনে মনে বলল ''তোমায় এত জ্বালিয়েছি মা ?'' ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বার করে খেয়ে আবার ডায়েরীটা খুলল। কতবছর পর মাকে আবার কাছে পেল। সেই যে একবার বোর্ডিং স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এল, দেখল মা নেই। মা নাকি মারা গেছে। বড় হওয়ার পর বলা হয়েছিল মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যা। বোর্ডিং স্কুলের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও মা ছাড়া বাড়িটা যেন অসম্পূর্ণ। সেদিন ছাদে গিয়ে একা একা অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। না হয়, ও ব্যাড বয়, তাই ওকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বোর্ডিংয়ে আরো তো অনেক ব্যাড বয় আছে, ভগবান তো ওদের মায়েদের কেড়ে নেন না। ও কি এমন বেশি অন্যায় করল ? সবাই বলে প্রিয়জনেরা মারা গেলে আকাশে তারা হয় সর্বক্ষণ আমাদের আগলে রাখে। সেদিন থেকে ও আকাশের তারাদের মধ্যে মাকে

খোঁজে, কিন্তু কোনোদিন ঠাওর করতে পারেনি কোনটা ওর মা। কতদিন, কত রাত হাত পা ছুঁড়ে কেঁদেছে ''মা তুমি ফিরে এসো, আমি তোমায় আর একটুও বিরক্ত করব না।'' ঠিক যেমন ছোটবেলায় মা রেগে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে দিলেই চেঁচাতে ''আর কব্বো না, ভাল হয়ে থাকবো, কথা শুনব''। মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের কোনোরকম স্মৃতিই রাখতে চায়নি বাবা বা দাদু ঠাম্মা, মায়ের প্রসঙ্গ তোলা হত না কোনোদিন। সন্দেশের পাগল মা যেন একটা ট্যাবু।

আবার পড়া শুরু হল। ''ছেলে আমার দুগ্গা ঠাকুরের দশ হাতে কি কি অস্ত্র আছে জানে, বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ব্রহ্মার কমন্ডুল, অমৃত মন্থন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অনেক কিছু জানে। এত কিছু জানে শুনে লোকে গদগদ হয়। ভরপুর বিনোদন। কাউকে সে রাবণ হয়ে পুষ্পক রথে করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কখনো বা কৃষ্ণের মত আঙুলে করে গোবর্ধন পর্বত তুলছে আবার কারুর হাত ধরে কিষ্কিন্ধা নিয়ে চলেছে। বারান্দা থেকে কথা বলে বলে পাড়া শুদ্ধ লোকের সাথে ভাব। দুদিন রাস্তায় না বেরোলে পাড়ার দোকানদাররা বলে ''বৌদি ওকে অনেকদিন দেখিনি, ওকে একটু নিয়ে আসুন না ? ভারী মজা লাগে ওর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো শুনতে।'' লোকের সামনে হাসি বটে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী শোনানোর যে এরকম ভয়ঙ্কর ফল হতে পারে কেউ দুঃসপ্নেও ভাবতে পারবে না।

এত পৌরাণিক আর দেব দেবীর গল্পের মধ্যে আমার ছেলের মগজে একমাত্র প্রভাব বিস্তার করেছে অস্ত্রসস্ত্র। সারাদিন তার মুখে তীর, ধনুক, ত্রিশূল, খড়্গ, কুঠার, গদা, বল্লম এইসব। সারাক্ষণ সে সবাইকে ত্রিশূল ছুঁড়ে দিচ্ছে বা খড়্গ বা কুঠার দিয়ে বধ করে দিচ্ছে। অনেকের মত ছেলের বাবাও বলে আমি হাইপার হচ্ছি। এসব পাসিং ফেজ, কেটে যাবে। হয়ত এসব শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম যদি না এই একরত্তি ছেলের এত রাগ আর জেদ হত। যেটা চাই তো চাইই। আমি মোটেই প্রশ্রয় দিই না, ওর বাবা বা দাদু ঠাকুমাও নয়। তবুও ছেলে এইরকম। ওর মনের মত কিছু না হলেই দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে অথবা বলছে ''আমি মরেই যাব''। কোত্থেকে যে এসব শিখছে জানি না। আমি উচ্চশিক্ষিত মা নই, চাকরি বাকরিও আমার দ্বারা হয়নি। সংসার নিয়েই দিনরাত কেটে যায়। চেয়েছিলাম ছেলেটাকে ভালো মানুষ তৈরি করব। শরীরের ওপর অনেক রাসায়নিক অত্যাচারের পর সন্দেশকে পৃথিবীর আলো দেখাতে পেরেছি। আর তারপর রাতজাগা, হিসু, হাগু ইত্যাদি। তা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই, সব মায়েরাই করে থাকে। কিন্তু সবকিছুর পরেও ওই একরত্তি ছেলে যখন কথায় কথায় বলে ''তুমি খুব বাজে মা, তোমার মত মা চাই না, তুমি চলে যাও, তুমি মরে যাও'' চোখের জল তখন বাঁধ মানে না। ও ছোট, এসবের মানেই বোঝেনা এই জাতীয় স্বান্ত্বনা আমার মনের দহন কমাতে পারে না। মনে হয় নিস্ফলা এ জীবন, কার জন্য বেঁচে থাকব ?

আমি চটকদার, চাকুরিরতা মা হয়ত হতে পারি নি কিন্তু নিজের স্বল্প জ্ঞান আর বিবেচনা দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করি সন্দেশকে ভালোভাবে মানুষ করার। এতটুকু বয়সেই সন্দেশ অজস্র গল্প জানে। শুধু রূপকথা নয়, ঐতিহাসিক গল্প, এমনকি অনেক কিশোর সাহিত্যও আমি ওকে ওর উপযোগী করে বলি। আর সবসময় চেষ্টা করি গল্পের শেষে একটা শিক্ষামূলক বা ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে। ওকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য নিত্য নতুন খেলা উদ্ভাবন করি। কখনো বা তিনি মাথায় তোয়ালের ব্যান্ডেনা বেঁধে জলদস্যু আবার কখনো সেই তোয়ালে মুড়েই সেলুনে চুল, দাড়ি কাটছেন। আমরা মা ছেলে আবার আফ্রিকার জঙ্গলে ও চলে যাই। আমাদের চাদরের তাঁবুর বাইরে ঘোরা ফেরা করে সব হিংস্র জানোয়ার।

মায়ের লেখাগুলো পড়ে সন্দেশের আবার নতুন করে অনেক কিছু মনে পড়ে গেল। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া অনেক কিছু। মৃদু হাসি খেলে গেল ঠোঁটের কোনায়। ডায়েরীটা বন্ধ করে মায়ের গোদরেজের আলমারিটা খুলল। ভেতরে আর যা যা আছে খালি করতে হবে। এবারেই সব জিনিসপত্র বেচে ফ্ল্যাট খালি করে রেখে যাবে, পরের ছুটিতে এসে ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দেবে। ফ্ল্যাটটা বাবা ওর নামে লিখে দিয়েছে কিন্তু কলকাতায় ফ্ল্যাট রেখে ও আর কি করবে ? কলকাতার সাথে আর ওর কিসের যোগাযোগ ? বাবা তার হাই ফ্লাইং দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় সেটেল্ড। স্কাইপে কথা হয় মাঝে মাঝে। সন্দেশ নিজেও বিদেশে, প্রতিষ্ঠিত। ভালোই আছে। গুমরে গুমরে মরল শুধু বেচারি মা। ইশ, তখন যদি ও আরেকটু ম্যাচিউর হত, একটু বুঝতে পারত মায়ের কষ্ট। তাহলে হয়ত মাকে এভাবে চলে যেতে হত না।

আলমারি থেকে কোচকানো মচকানো অবস্থায় বেরোলো মায়ের লেখার খাতাগুলো আর বেশ কয়েকটা ওয়াটার কালার। রঙ উঠে গেছে, ভাঁজ পড়ে গেছে হ্যান্ডমেড পেপারে। মনে পড়ল, মা লিখত বটে। খুব শখ ছিল ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার। সে আর হয়ে ওঠেনি। সন্দেশ খাতাগুলো আলাদা করে সরিয়ে রাখল। এগুলো ও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। প্রতিটা লেখা ও পড়ে দেখবে। মায়ের লেখার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই মাকে আরেকটু বেশি চিনতে পারবে। আলমারিতে জামাকাপড় বিশেষ কিছু নেই মায়ের। আলমারি ভর্তি যা আছে তা হল মায়ের প্রাণাধিক প্রিয় সফট্ টয়ের কালেকশন যেগুলো ছোটবেলায় মা ওকে দিয়েছিল আর ও সেগুলোর চোখ, নাক, মুখ সব ঘুচিয়েছিল। আর একটা ফাইল বেরোলো, মায়ের মেডিক্যাল ফাইল। সেসব দেখে আর কি হবে ? তার চেয়ে বরং ডায়েরীটাই শেষ করা যাক।

সারাদিন দোষারোপ শুনতে আমার ভালো লাগে না। ছেলের বাঁদর হওয়ার সমস্ত দায়ভার আমার। ছেলের বাবা উঁচুদরের চাকরি করে, এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় নেই তার। আমি তো সারাদিন বাড়িতেই থাকি, তাহলে করি টা কি ? ছেলেটাকেও মানুষ করতে পারি না ? স্কুল থেকেও রোজ কমপ্লেন আসে। ছেলে অবাধ্য, মুখ মুখে কথা বলে, মারকুটে, লেখাপড়া করে না, সমস্ত জিনিস ভেঙে চুরে নষ্ট করে — এর জন্য একশো ভাগ দায়ী আমি। একটু কাগজ বা বই নিয়ে বসলেই হল, শ্বশুর বা শ্বাশুড়ি চিৎকার করে ওঠে ''ছেলেটাকে দ্যাখো কি করছে। ওকে ঘরে আটকে রাখো'। আচ্ছা, আমার কি একটুও নিজের মত বাঁচার অধিকার নেই ? আমি কি শুধু কারুর স্ত্রী বা মা ? শুধু কর্তব্য করে যাব আর বিনিময়ে কি পাব ? অসম্মান আর অমর্যাদা ? নাহ, আর পড়তে পারল না সন্দেশ। ক্রমশ মনে হচ্ছে মায়ের মৃত্যুর জন্য ওই দায়ী। এখনো লাঞ্চ হয়নি তাও এই ভরদুপুরে পেগ সাজিয়ে বসল। মনের সমুদ্রে সুনামি এসেছে। কি মনে হল হঠাৎ, মেডিক্যাল ফাইলটা খুলল। অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে একটা মেন্টাল হসপিটালের এডমিশন ফর্ম। মায়ের নামে। মৃত্যুর সালে। তবে কি মা মারা যাওয়ার আগে এসাইলামে ছিল ?

নীল ঝলমলে আকাশ। চাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বিমান আকাশে ডানা মেলল। শরৎকাল। মা দুর্গার মত সন্দেশ ও বাড়ি আসছে। তবে মায়ের কাছে। চিরতরে। সন্দেশের মা এখনো বেঁচে আছেন। হ্যাঁ, মানসিক ভারসাম্যহীন। এতবছর তার থেকে এই সত্যটা গোপন করা হয়েছিল, তারই ভালোর জন্য নাকি। পাগল মা থাকার চেয়ে মা না থাকা ভালো। সাইকেয়াট্রিক পেশেন্টের হাত থেকে আইনী ছুটকারা পেতে বাবারও অসুবিধা হয়নি। সে যাকগে, মায়ের সাথে আর বঞ্চনা নয়। মা চেয়েছিল ছেলে বড় হয়ে মায়ের সঙ্গী হবে। আজ থেকে সন্দেশ সে স্বপ্ন পূরণ করবে। সে হবে মায়ের সঙ্গী, আমৃত্যু।

গুডবাই সিঙ্গাপুর, গুডবাই সিং ডলার।

পিয়ালী গাঙ্গুলী : পেশায় শিক্ষিকা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ। বাড়ি কলকাতা। তিন বছরের এক দস্যি ছেলের মা। বই পড়তে, লিখতে, ছবি আঁকতে, বেড়াতে যেতে, সাঁতার কাটতে আর ঘুমোতে ভালোবাসি। ভীষণ লোভীও। আর ভালোবাসি স্বপ্ন দেখতে। মস্তিষ্ক কম চলে (বিশেষ কিছু নেই ওই জায়গাটায়), সবকিছুই হৃদয় দিয়ে করি। আর ঠকি। তাও আবার করি।

‘বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে’

Cleveland, Ohio-তে অনুষ্ঠিত ‘‘পঞ্চরসের ধারা’’

“পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী -”